বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম-এর মুখপত্র

নবীনকণ্ঠ

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে...

ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি.

৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম-এর মুখপত্র

৩য় বর্ষ । ৭ম সংখ্যা । ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি.

মাসিক

নবীনকণ্ঠ

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে...

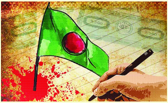

প্রতিষ্ঠা

ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. / শাবান, ১৪৪৪ হি. / ফাল্গুন, ১৪২৮ ব.

উপদেষ্টা

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানি হা.

তত্ত্বাবধায়ক

মুহা. সায়েম আহমাদ

প্রধান সম্পাদক

মাকামে মাহমুদ

সম্পাদক

উসমান বিন আ. আলীম

নির্বাহী সম্পাদক

বিন-ইয়ামিন সানিম

বিভাগীয় সম্পাদক

কাজী মা'রুফ

রাশেদ নাইব

ব্যবস্থাপনায়

আব্দুল্লাহ আল মামুন আশরাফী, মুফতী ইমদাদুল্লাহ,
মুফতী আবুল ফাতাহ কাসেমী, আনিসুর রহমান আফিফি,
মুফতী মাসউদ আলিমী, রহমাতুল্লাহ জুবায়ের,
মুহাম্মাদুল্লাহ আহনাফ, মুহা. হাছিব আর রহমান,
মুফতী ওলিউল্লাহ তাহসিন,
শামসুল আরেফিন, তাশরীফ আহমদ,
জাবের মাহমুদ, মাও. হাবিব উল্লাহ,
জুবায়ের আহমেদ, মুফতী সাইফুল্লাহ,
হুসাইন আহমদ, মুহা. আব্দুর রশীদ।

যদি নবীনকণ্ঠ 'প্রিন্ট' করে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারতাম, তাহলে বেশি ভালো লাগত। আপাতত 'পিডিএফ' করে সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনাদের সামনে দেওয়ার চেষ্টা করছি, আলহামদুলিল্লাহ। দু'আয় আমাদের স্মরণ করবেন।

যোগাযোগ

অস্থায়ী ঠিকানা : বলিয়ারপুর, সাভার, ঢাকা। সম্পাদক : ০১৭৮৯২০৪৬৭৪

নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৪৭৬২৯৮০৯ ইমেইল : nobinkanthobnlf@gmail.com

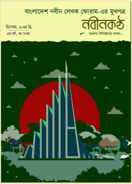

৩য় বর্ষ । ৭ম সংখ্যা
ডিসেম্বর-২০২৪ খ্রি.

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে
নবীনকণ্ঠ'র এবারের
আয়োজন শীত ও বিজয়
সংখ্যায় যারা লিখেছেন:

লেখকসূচি

সম্পাদকীয়, বিন ইয়ামিন সানিম

প্রবন্ধ

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী
মুফতী রহমাতুল্লাহ জুবায়ের
হুসাইন আহমদ
আব্দুর রশীদ
রহমতুল্লাহ শিহাব
ইয়াসিন আহসান

স্মৃতিচারণ

মেরাজুল ইসলাম শওকত
জুবাইর আল হাদী
খায়রুল বাশার রায়হান
খালিদ নিশাচর
আশিকুল্লাহ মাহমুদ
মাইমুনা মুন্নি

মতামত

সাইফুল ইসলাম, সাধন সরকার, হৃদয় পান্ডে

ছড়া/কবিতা

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম, এম আর মাহফুজ,
খোরশেদ আলম, সুমাইয়া রহমান,
ইবনুল হাফিজ তানভীর, বিশ্বজিৎ সমাদ্দার
মুহিব্বুল্লাহ ফুয়াদ, নিলুফা ইসলাম,
জাহিদ বিন মোস্তফা, মোহাম্মদ নূর ইসলাম,
এইচ এম শাহেদুল ইসলাম তানভীর,
ফরিদ আহমদ ফরাজি, ইয়াকুব আলী তুহিন,
কুলসুম বিবি, শাজাহান কবীর শান্ত,
রেজাউল করিম রোমেল, মানসী খাতুন,
আবদুল লতিফ, শাহজালাল সুজন, সোহাগ নূর,
মাসরুর হাসান, যুবায়ের আল মাহমুদ,
বশির আহমদ লতিফী, সাদিয়া সুলতানা,
আহাদ আলী মোল্লা।

ভ্রমণকাহিনি

তাওহীদুর রহমান,
সাজিদ বিন আওলাদ,
মাহদী গালীব, আদিবা রায়হান,
ইবনুস সা'ঈদ

ইতিহাস

ওমর ইবনে আখতার
ইতাঙ্গীর খন্দকার
হৃদয় পান্ডে

গল্প

সাজিদুল ইসলাম সাজিদ,
আমাতুল্লাহ শারমিন,
হাবিবুন নাহার মিমি,
মাসুমা সুলতানা হাসনাহেনা,
ইসমত আরা সুপ্তি

রোজনামচা

মজহুল, শেখ আব্দুর রহমান,
মো. আশিকুর রহমান খান
বাইজিদ আফনান,
সৈয়দা ফারিহা আকতার,
রাহিল, ইয়াছিন আবরারী

জীবনচরিত

মুফতী আব্দুল্লাহ আল মামুন আশরাফী

সহযোগিতায়: নাজিফ (আভিজাত্যে অনন্য, বিশ্বাসে অটুট)
যোগাযোগ
০১৭৪৭৬২৯৮০৯

সম্পাদকীয়

শীতের পরশে বিজয়ের অনুপ্রেরণা

ডিসেম্বর আমাদের কাছে এক অনন্য অনুভূতির নাম। এ মাসে শীতের হিমেল বাতাস যেমন প্রকৃতিকে নতুন সাজে সাজিয়ে তোলে, তেমনই আমাদের জাতীয় জীবনে এ মাস নিয়ে আসে বিজয়ের গৌরবগাথা। শীত ও বিজয়-এই দুই অনুপ্রেরণা নিয়ে নবীনকণ্ঠ-এর এবারের সংখ্যাটি প্রকাশিত হলো।

শীত বাঙালির জীবনে এক স্বতন্ত্র আবেদন নিয়ে আসে। শিশিরভেজা সকাল, কুয়াশাচ্ছন্ন প্রকৃতি, খেজুরের রস, আর পিঠাপুলির আয়োজন আমাদের শেকড়ের প্রতি টান বাড়িয়ে দেয়। এই ঋতু যেন আমাদের জীবনকে নতুন রঙে রাঙায়। শীতের প্রতিটি মুহূর্ত প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যকে উপভোগ করার আহ্বান জানায়।

তবে ডিসেম্বরের শীত বাঙালির কাছে শুধু ঋতু পরিবর্তনের বার্তাই নয়, এটি বিজয়ের এক মহাস্মৃতিও বহন করে। ১৯৭১ সালের এই ডিসেম্বর মাসেই আমাদের দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রাম সফল হয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে আমরা পেয়েছিলাম আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা। এই বিজয় শুধু ভূখণ্ডের নয়, এটি ছিল আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং জাতিসত্তার বিজয়।

এই বিজয়ের পেছনে রয়েছে লাখো শহিদের আত্মত্যাগের গল্প। রয়েছে মুক্তিকামী মানুষের অদম্য সাহস ও লড়াই। এই গল্পগুলো আমাদের জন্য শুধু গর্বের নয়, এগুলো আমাদের চলার পথের প্রেরণাও। বিজয়ের ৫৩ বছরে আমরা যে অগ্রগতি অর্জন করেছি, তা আমাদের এই আত্মত্যাগের ঋণে বাঁধা।

এবারের সংখ্যায় শীতের সৌন্দর্য ও বিজয়ের গৌরবকে ফুটিয়ে তুলতে আমরা তুলে ধরেছি বিভিন্ন প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ও স্মৃতিচারণ। নবীন লেখকদের

সৃষ্টিশীলতা আর তাদের চেতনার ছোঁয়া আমাদের এ সংখ্যাকে অনন্য করে তুলেছে। পাশাপাশি রয়েছে বিজয় দিবসের প্রেক্ষাপটে বিশেষ রচনা, যেখানে নতুন প্রজন্মের জন্য বিজয়ের মূল্যবোধ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমাদের বিশ্বাস, শীত ও বিজয়ের এই যুগল অনুভূতি পাঠকের মনে নতুন ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে। বিজয়ের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা প্রত্যেকে নিজেদের অবস্থান থেকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

সবশেষে, আমাদের নবীন লেখক ও পাঠকদের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনারা নবীনকণ্ঠ-এর সঙ্গে থাকুন, আপনাদের চিন্তা ও সৃজনশীলতার গল্প আমাদের জানিয়ে দিন। জাযাকুমুল্লাহু আহসানাল জাযা।

বিন ইয়ামিন সানিম
নির্বাহী সম্পাদক, নবীনকণ্ঠ

স্বাধীনতার গুরুত্ব ও ইসলাম

মুফতি রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

স্বাধীনতা মহান আল্লাহ তায়ালার অনন্য একটি নিয়ামত। প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ও নারী-পুরুষনির্বিশেষে সব মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন। মহানবী (সা.) বিদায় হজে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে দ্বীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন- 'নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের মর্যাদা তোমাদের জন্য হারাম, যেমনিভাবে এ পবিত্র ঈদের দিন, এ হজের মাস ও মক্কা নগরীকে হারাম করা হয়েছে তোমাদের জন্য।' (সহিহ বুখারি ৬৭)।

অপর হাদিসে রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'হে লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক। শোন! অনারবের ওপর আরবের, আরবের ওপর অনারবের এবং কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শেতাঙ্গের ও শেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তাকওয়া ব্যতীত। তোমাদের মধ্যে মর্যাদাবান সে-ই যে অধিক তাকওয়ার অধিকারী।' (বায়হাকি-৫১৩৭)।

কোনো মানুষের অন্য কোনো ব্যক্তি বা জাতির প্রতি অত্যাচার ও শোষণ করার

অধিকার নেই। নেই কারও অধিকার ক্ষুণ্ন করার অনুমতি। বরং নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং আত্মরক্ষার জন্য সক্রিয় হওয়া সব মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আপন আপন মাতৃভূমি দেশের সব নাগরিকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ আমানত। জানমাল বিসর্জন দিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। মহানবী (সা.) ঘোষণা করেন, 'আল্লাহর রাস্তায় এক দিন সীমান্ত পাহারায় নিয়োজিত থাকা দুনিয়া এবং এর সবকিছু অপেক্ষা উত্তম।' (সহিহ বুখারি-২৮৯২)।

অপর হাদিসে তিনি ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষায় মারা যায় সে শহীদ, যে ব্যক্তি ধর্ম রক্ষায় মারা যায় সে শহীদ, যে ব্যক্তি নিজের প্রাণ রক্ষায় মারা যায় সে শহীদ, যে ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা রক্ষায় মারা যায় সে শহীদ।' (তিরমিজি-১৪২১)।

ইসলাম প্রতিটি মানুষের চিন্তাচেতনা ও বিবেকবুদ্ধির স্বাধীনতা প্রদান করেছে। স্বাধীনতা প্রদান করেছে প্রত্যেকের মত প্রকাশ, ভৌগোলিক অবস্থান এবং শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। ইসলাম আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম, তা সত্ত্বেও মহান প্রভু সব মানুষকে আপন আপন বিবেকের চাহিদা অনুযায়ী এ বিশ্বে যে কোনো ধর্ম গ্রহণের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন, 'ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।' (সুরা বাকারা-২৫৬)।

ইসলাম যেভাবে ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেকের স্বাধীনতা প্রদান করেছে, এভাবে সবকিছুতে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে। হাদিসের কিতাবে সুপ্রসিদ্ধ একটি ঘটনা, মহানবী (সা.) জনৈক মহিলা বারিরা (রা.)-কে তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ থেকে বারণ করেছিলেন। বারিরা (রা.) রসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জানতে চান, এটা কি আপনার নির্দেশ নাকি পরামর্শ। রসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, নির্দেশ নয়, বরং পরামর্শ। বারিরা (রা.) উত্তর দেন, তাহলে আপনার পরামর্শমূলক অভিমত গ্রহণ করা ও না করার ক্ষেত্রে আমি স্বাধীন। (সহিহ বুখারি-৫২৮৩)।

স্বাধীনতা একজন মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার প্রথম অধিকার। মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে নিয়ে সর্ব প্রকার স্বাধীনতাকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সারা জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্যের অন্যতম ছিল মজলুম জনতার স্বাধীনতা অর্জন করা এবং আল্লাহর সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ত করা। তিনি আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর আগে আইয়ামে জাহেলিয়াতের অন্ধকার ও পরাধীনতা দূর করে মদিনা নগরীতে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মদিনাকে স্বাধীন করেছিলেন ইহুদিদের কবল থেকে। স্বাধীন রাষ্ট্রের ভিতকে মজবুত করার জন্য মদিনা ও পার্শ্ববর্তী

অঞ্চলের মুসলমান, ইহুদি ও পৌত্তলিকদের নিয়ে সব জাতি ও সম্প্রদায়ের মানবিক ও ধর্মীয় অধিকারকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন করেন, যা 'মদিনা সনদ' নামে প্রসিদ্ধ। একটি স্বাধীন কল্যাণ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এটিই পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান। মহানবী (সা.) সুদীর্ঘ ১৩টি বছর মক্কায় পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ ছিলেন। মদিনায় ১০ বছর অবস্থানের পর সব রকম অন্যায়-অনাচার, দুর্নীতির প্রাচীর ভেঙে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গোটা আরবে ঐতিহাসিক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র।

এ পরিসরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার দাবি রাখে। স্বাধীনতা বলতে জুলুম-অত্যাচার ও শোষণমুক্ত একটি পরিবেশে আপন আপন আত্মমর্যাদা নিয়ে ধর্ম, কর্ম পালন করার সুষ্ঠু ব্যবস্থাকে বোঝায়। সব ধরনের স্বায়ত্তশাসন ও স্বেচ্ছাচারিতাকে বিলুপ্ত করে আপন আপন চিন্তাচেতনা বাস্তবায়নের সুযোগ প্রবর্তন হওয়াকে স্বাধীনতা বোঝায়। যা একটি জাতি, দেশ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থাকে বোঝায়, যেখানে তাদের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা ও আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব থাকবে। অতএব স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। যা খুশি তা করা নয়। শান্তি-শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানকে জলাঞ্জলি দেওয়া এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার নাম স্বাধীনতা নয়। নয় মহান প্রভুর বিধিনিষেধ অবজ্ঞা করা ও তাঁর প্রতি দৃষ্টতা প্রদর্শনের স্বাধীনতা।

লেখক : গবেষক, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা

বিজয় দিবস বনাম চূড়ান্ত মুক্তি

মুফতী রহমাতুল্লাহ জুবাইর

বিজয় শব্দের আরবি 'ফাতহ' অর্থাৎ সফলতা, জয়। পবিত্র কুরআনের ৪৮তম সূরার নাম রাখা হয়েছে এ নামে।

মানুষের জীবনে বিজয়-সফলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। তা ব্যক্তি জীবনে হোক বা সামাজিক জীবনে। দীর্ঘ সংগ্রাম আর অসীম ত্যাগ ও বিসর্জনের মধ্য দিয়ে এটি অর্জন হয়। বিজয়ের পূর্ব মুহূর্ত জুলুম লাঞ্ছনা-বঞ্চনা আর নৃশংসতায় ভরা থাকে। বিজয়োত্তর সময় প্রাপ্তি আর মুক্তিতে অম্লান থাকে। এজন্য বিজয়ের দিনটিকে মানুষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। বিজয় সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমত-জাগতিক বিজয়। দ্বিতীয়ত-পরকালীন মুক্তি বা চূড়ান্ত বিজয়।

জাগতিক বিজয় :

পৃথিবীর ইতিহাসে বিজয়ের ধারাবাহিকতা আদিকাল থেকেই চলে আসছে। ভৌগোলিক সীমারেখায় অবস্থিত প্রতিটি

অঞ্চল আর এলাকার সূত্রপাতে বহুল প্রত্যাশিত কোনো বিজয় বা কোনো না কোনো ইতিহাস রয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর বিপরীত নয়। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক এই নামটি জন্ম হওয়ার পিছনে রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। আমাদের পূর্বপুরুষগণ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে। সর্বপ্রথম ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে এই ব্রিটিশরা ভারতে আগমন করে। পরে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামে তাদের একদল বণিক প্রতিনিধি বোম্বাইয়ের সামুদ্রিক কিনারায় এসে অবস্থান নেয়। প্রায় একশত বছর পর ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে দেখা যায় ভারতের কয়েকটি ছোট ছোট এলাকায় তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই ধারাবাহিকায় ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম শাহ আব্দুল আজিজ দেহলবী (রহ.) দেখলেন, ইংরেজরা ভারতের বড় বড় এলাকা দখল করে নিয়েছে।

ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়, তিনিই সর্বপ্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে মানুষের অন্তরে শত্রুতার বীজ বপন করেন। একপর্যায়ে তিনি ভারত উপমহাদেশে তাদের টানা ২০০ বছরের অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং ভারত উপমহাদেশকে 'দারুল হারব' শত্রু কবলিত ঘোষণা করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতোয়া জারি করেন। তার এই ঘোষণা গোটা ভারতবর্ষে দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সবাই ব্রিটিশদেরকে উপমহাদেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই পথ ধরেই সংঘটিত হয়েছিল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী আন্দোলন, রেশমী আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলন। হাজারো লাখো আলেম-ওলামা ও সর্বসাধারণের জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়ে অবশেষে স্বাধীন হয়েছে ভারতবর্ষ।

এ লড়াই শেষ হতে না হতেই সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। মুসলমানদের দাবি জাতিগত ভিন্ন আবাসভূমির, আর হিন্দুদের দাবি নিজস্ব স্বাধীন এলাকার। অবশেষে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে গেল। একাংশের নাম হলো পাকিস্তান, অপর অংশের নাম হলো হিন্দুস্তান। হিন্দুস্তানের সবগুলো প্রদেশ একসাথে থাকলেও পাকিস্তানের প্রদেশগুলো ছিল ভিন্ন। মুসলিম পরিচয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানিরা জাতিভাই হিসেবে একীভূত হয়েছিল। পাকিস্তানি নেতারা জনগণের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল, কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক আইন রচনা করবে। পূর্ব ও পশ্চিমের জনগণের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। আইনের দৃষ্টিতে সকলে থাকবে সমান-বৈষম্যহীন, ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে।

কিন্তু আফসোস ও পরিতাপের বিষয়, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাদের কোন অঙ্গীকার ঠিক রাখতে পারল না। ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত হয়ে শুরু করল একের পর এক প্রতারণা জুলুম আর বৈষম্য।

সর্বশেষ **১৯৭১** সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালি জাতির নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড চালায়। যার ফলে বাঙালি জাতিও ঐক্যবদ্ধ হয়ে সশস্ত্র মুক্তির লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় এবং পশ্চিমা হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। অবশেষে বাংলার অকুতোভয় গর্বিত বীরমুক্তিযোদ্ধারা দীর্ঘ নয় মাস মরণপণ লড়াই করে অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে **১৯৭১** সালের **১৬** ডিসেম্বর বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল।

কিন্তু বিজয় অর্জন হলেও বাঙালির সংগ্রাম থেমে যায়নি। বিভিন্ন সময় এই বিজয় ও স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। আর তা অক্ষুণ্ন রাখতে সংগ্রাম করতে হয়েছে তাদের। বিশেষত প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তাদের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করার হীন চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। বিগত **১৬** বছর এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী হলো এ দেশের আঠারো কোটি জনগণ। ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনার নেতৃত্বে এ দেশের মানুষকে দাস বানিয়ে পরাধীন করে রাখতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু এ দেশের বিপ্লবী ছাত্র-নাগরিকগণ তা হতে দেয়নি। ভারতের এই আধিপত্যবাদ ও দাদাগিরির বিরুদ্ধে পুরো দেশ একসাথে জেগে উঠেছে এবং তাদের পোষা দাসী হাসিনা ও তার আওয়ামী গুন্ডা বাহিনীকে সর্বাত্মক প্রতিরোধ করে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে পরাজিত করেছে।

চলতি ২০২৪ সালের ৫য়ে আগস্ট ছাত্র-নাগরিক মিলে ভারতের দাসী হাসিনা ও তার দোসরদের দেশছাড়া করে এ ভূখণ্ডের বিজয় ও স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধার করেছে।

কিন্তু একজন মুসলিম ঈমানদার ব্যক্তির জন্য এ বিজয় চূড়ান্ত নয়। তাকে পাড়ি দিতে হবে আরো বহু পথ। দুনিয়ার এই মিছে গন্তব্য অতিক্রম করে শুরু করতে হবে নতুন এক যাত্রা। সেই যাত্রার বিজয় আর সফলতা নিয়েই তাকে চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছতে হবে।

চূড়ান্ত বিজয় :

দুনিয়ার জয়-পরাজয় সবই ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃত বিজয় পরকালের বিজয়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন, যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই হল প্রকৃত বিজয়ী। (সূরা আলে ইমরান-১৮৫)

অর্থাৎ যদি কখনো কোথাও কাফেররা বিজয়ী হয়ে যায় এবং পার্থিব সকল আরাম আয়েশ লাভ করে। আর এর বিপরীতে মুসলমানগণ পরাজয় বিপদ-আপদ জটিলতা ও পার্থিব উপকরণের সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়, তাহলে এতে পেরেশানির কিছু নেই। কারণ পার্থিব সুখ-দুঃখ কয়েকদিনের জন্য মাত্র। মুসলমানরাই

শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে অনন্তকালের জন্য জান্নাতের আরাম আয়েশ ও শান্তির অধিকারী হবে এবং এটিই তার চূড়ান্ত বিজয় ও সফলতা।

পক্ষান্তরে কাফেরদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর এটিই তার চূড়ান্ত পরাজয় ও পরিণাম।

অন্যত্র ইরশাদ করেন, জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। জান্নাতের অধিবাসী তারাই সফলকাম। (সূরা হাশর-২০)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন নেককার এবং বদকারগণ সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে সমান হবে না। জান্নাতের অধিবাসীরা সফলকাম হবে জান্নাতের স্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে এবং এটাই তাদের বড় অর্জন ও সফলতা।

আরো ইরশাদ করেন, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে জান্নাত,যার তলদেশে প্রবাহিত হয় ঝরনাসমূহ। (সূরা আল বুরূজ-১১)

অর্থাৎ দুনিয়ার জুলুম-নির্যাতন ও কষ্ট-ক্লেশে ঘাবড়ানো উচিত নয়, বরং চূড়ান্ত সফলতা ঈমানদারদের জন্যই। আর তা এমন সফলতা, যার তুলনায় দুনিয়ার আরাম আয়েশ বা কষ্ট-ক্লেশ সবই তুচ্ছ।

অনুরূপভাবে ইরশাদ হলো, আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। (আয়াতের শেষাংশে) সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সেই লেনদেনের উপর, যা তোমরা করছ তার সাথে। আর এই হলো মহান সাফল্য। (সুরা তওবা-১১১)

অর্থাৎ অস্থায়ী জান মালের বিনিময়ে স্থায়ী জান্নাত পাওয়া অধিক লাভজনক ও বরকতময়। মুমিনের জন্য এটিই সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত সফলতা।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পার্থিব জীবনের সফলতা আর বিজয়ের পাশাপাশি পরকালীন মুক্তি ও চূড়ান্ত সফলতা দান করুন। আমিন।

শিক্ষাসচিব, মারকাযুত তারবিয়াহ বাংলাদেশ, সাভার, ঢাকা।

বিজয়ের চেতনায় জাগ্রত হোক দেশপ্রেম

মু. সায়েম আহমাদ

দেশপ্রেম একটি মহৎ গুণ। নিজ জন্মভূমি স্বদেশ নামে পরিচিত প্রত্যেক মানুষের নিকট। দেশের প্রতি ভালোবাসা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যে মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম নেই, সে মানুষ হলেও কিন্তু প্রকৃত মানুষ নয়। প্রকৃত মানুষ তো সেই, যার স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা, আবেগ ও অনুভূতি রয়েছে। সর্বদায় দেশের কল্যাণার্থেই ভূমিকা রাখার চিন্তা চেতনা রয়েছে। মা যেমন প্রত্যেক সন্তানের কাছে প্রিয়, ঠিক তেমনি প্রত্যেক জনগণ বা মানুষের কাছে তার জন্মভূমি অধিক প্রিয়।

কেননা, একজন মা যেমন তার সন্তানকে সঠিক পরিচর্যার মধ্য দিয়ে লালন পালন করেন। ঠিক তেমনি জন্মভূমিও প্রত্যেক মানুষকে খাদ্য দিয়ে, আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, ফুল-ফল দিয়ে গড়ে তোলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কান্ডারী হিসেবে। প্রিয় জননীর সাথে সন্তানরা যেমন সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে না। তেমনি প্রিয় মাতৃভূমির সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না। তাই,

দেশপ্রেম বলতে শুধু দেশের মাটির প্রতি ভালোবাসাকে বুঝায় না। স্বদেশের আলো-বাতাস, ফল-ফুল, মাটি পানি, প্রকৃতি-পরিবেশ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, জাতি ও ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ, নিবিড় ভালোবাসা ও যথার্থ আনুগত্যকে দেশপ্রেম বলা হয়। দেশপ্রেমিক হবে দেশের গৌরব ও মর্যাদার নমুনা বা প্রতীক। তার চরিত্র ও আদর্শ দিয়েই প্রমাণ করতে হবে সে কোন দেশের নাগরিক এবং দেশের প্রতি তার মমত্ববোধ ভালোবাসা, আবেগ ও অনুভূতি কতটুকু। কিন্তু সত্যিই কি আমাদের মাঝে এমন দেশপ্রেমের নমুনা আছে? প্রশ্ন থেকে যায়।

ফিরে দেখা বিশ সালে করোনা ভাইরাসের রাজত্ব চলছিল পুরো বিশ্বে। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো যখন দেশের জনগণের প্রতি সহযোগিতা এবং নিরাপত্তা দিতে ব্যস্ত। ঠিক তখনি আমাদের দেশের কিছু অসাধু ব্যক্তিগণ দুর্নীতি আর দেশের মর্যাদাক্ষুন্নে ব্যস্ত। আমাদের দেশে কিছু অসাধু ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য করোনার নকল সার্টিফিকেট প্রদান করে প্রবাসীদের বিদেশ যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। বিশ্ব মিডিয়ায় করোনার ভুয়া সার্টিফিকেট বিক্রির জন্য দেশটির গণমাধ্যমে এসেছে বাংলাদেশের নাম। এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে অনেক দেশ বাংলাদেশীদের প্রবেশাধিকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। এতে করে আমাদের দেশের মর্যাদার বিপরীতে সম্মানহানি বা মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে পুরো বিশ্ববাসীর কাছে। পুরো বিশ্ববাসী আমাদের দেশকে করোনার নকল সার্টিফিকেট প্রদানকারী দেশ হিসেবে চিনবে।

শুধু যে এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে তা কিন্তু নয়। বরং সেই সময়ে সরকারি সহায়তা (ত্রাণ) বিতরণের ক্ষেত্রে দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছিল। ধর্ষণের মতো ঘৃণিত কাজটি প্রতিনিয়ত ঘটছে আমাদের দেশে। নারীরা কোথাও নিরাপত্তা পাচ্ছে না। তাহলে এই দায় কার? রাষ্ট্রের নাকি জনগণের? এটাই কি দেশপ্রেমের নমুনা? প্রশ্ন থেকে যায়। এমন ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত থাকতে হলে মন মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। কেননা, এই দেশের স্বাধীনতায় নারীদের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের প্রতিটি স্থানে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে বাংলাদেশ সরকারকে। সম্প্রতি, দেশের উপকূলীয় অঞ্চল গুলোতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খাদ্য সামগ্রী থেকে শুরু করে সকল কিছুতে তাদের অভাবনীয় অবস্থা। এই শীতের মৌসুমেও শীতবস্ত্রহীনদের অভাব-

অনটনের মধ্য দিয়ে চলছে তাদের জীবনযাত্রা। দেশ প্রেম হচ্ছে মানবপ্রেম। যে স্বদেশের দুঃখে দুখী হয় না, সে দেশের মানুষকে ভালোবাসে না। দেশের প্রকৃতিকে ভালবাসো না। তাই, আমাদের দেশের মানুষকে ভালবাসতে হবে। তাদের সুখে-দুখে পাশে থাকতে হবে। প্রকৃতিকে ভালবাসতে হবে। দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। আর এটাই হচ্ছে প্রকৃত দেশপ্রেমিক এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেশকে ভালোবেসে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর কাছ থেকে স্বাধীন করেছে এদেশের মুক্তিকামী লাখো মানুষ। এর পরবর্তী মুক্তি মিলছে ছাত্র- জনতার আন্দোলনে নিজেদের অধিকার রক্ষায় কতৃত্বপরায়ণ সরকারকে বিতাড়িত করার মাধ্যমে।

স্বদেশপ্রেমিকের দেশসেবার পথে বাধা অনেক, অত্যাচার সীমাহীন। কিন্তু পথের ঝড়-ঝঞ্ঝাট, প্রতিবন্ধকতা তাদের দৃঢ় বলিষ্ঠ পদক্ষেপের নিকট মিথ্যে প্রমাণিত হয়। ইতিহাসের পানে তাকালে এর দৃষ্টান্ত মিলে। পরদেশি কিংবা স্বৈরশাসকের রক্তচক্ষু কিংবা উদ্যত অস্ত্র দেশপ্রেমিকদের নিবৃত্ত করতে পারে না। প্রত্যেক দেশেই তার এই মাটিতে কিছু শ্রেষ্ঠ সন্তান জন্ম দেয়। যারা তাদের কৃতকর্মের জন্য অমরত্ব লাভ করে। আমাদের দেশে দেশপ্রেমের স্বাক্ষর রেখেছেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা, মীর কাসিম, সৈয়দ আহমদ, তিতুমীর এবং এই সময়ে এসে আবু সাঈদ, মীর মুগ্ধদের মতো অসংখ্য বীর ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ ও জুলাই বিপ্লবে জীবন উৎসর্গকারী লাখো বীর সেনানী। আমাদের দেশের ইতিহাস ও স্বদেশপ্রেমের গর্বে গর্বিত।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ১৯৯০ সাল এবং ২৪'শের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান আমাদের অনন্য স্বদেশপ্রেমের প্রমাণ দেয়। কিন্তু অন্ধ স্বদেশপ্রেম ধারণ করে ভয়ঙ্কর রূপ। অন্ধ স্বদেশপ্রেম জাতিতে জাতিতে সংঘাত ও সংঘর্ষ অনিবার্য করে তোলে। আমরা স্বদেশের জয়গান গাইতে গিয়ে যদি অপরের স্বদেশ প্রেমকে আহত করি, তবে সেই স্বদেশপ্রেম বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে ডেকে আনে ভয়াবহ রক্তাক্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত।

ইতিহাসের পাতায় হিটলারের ইউরোপ দখল কিংবা মুসোলিনের ইতালি উগ্র-জাতীয়তাবাদের নগ্ন-রূপ। চলমান বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক দুর্বল রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আগ্রাসী মনোভাব অন্ধ স্বদেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ। প্রত্যেক দেশের জনগণের আগ্রাসী মনোভাব পরিহার করতে হবে। এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করবে। তাহলেই সম্ভব বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আমাদের দেশের রাজনীতি নিয়ে অনেক কথা বা আলোচনা হয়। রাজনীতির আলোচ্য বিষয় হল দেশপ্রেম। স্বদেশপ্রেমের পবিত্র বেদীমূলেই রাজনীতির পাঠ। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ রাজনীতিবিদ দেশের সদাজাগ্রত প্রহরী।

আর প্রচ্ছন্ন রাজনীতির অবদানেই আজ আমাদের দেশ স্বাধীন। দেশ ও জাতির স্বার্থই দেশপ্রেমের অঙ্গীকার ও সার্থকতা।
তবে রাজনীতির নামে যারা চাঁদাবাজি, হরতাল, অবরোধ, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, হত্যা লুণ্ঠন সহ নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার মাধ্যমে জাতীয় সম্পদের ক্ষতি সাধন করে তাদেরকে দেশপ্রেমিক বলা চলে না। বরং তারা দেশ ও জাতির শত্রু। এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হবে দেশের প্রতিটি মানুষকে। পরিশেষে বলা যায়, বিজয়ের মাসে সকলের প্রাণে দেশের প্রতি ভালোবাসা, অনুভূতি, আবেগ বিস্তৃত হোক। দেশের প্রত্যেক নাগরিকদের উচিত এমন কোন কাজ না করা, যে কাজে দেশের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। বরং এমন কাজ করতে হবে, যে কাজে দেশের সম্মান বৃদ্ধি পায় পুরো বিশ্ববাসীর কাছে। সকল কাজে প্রমাণ করতে হবে সে কোন দেশের নাগরিক। প্রত্যেক জনগণকে দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং মান্য করার মন মানসিকতার অধিকারী হতে হবে। দেশের জনগণকে দুর্নীতি সহ সকল ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অপরিসীম। তারাই আগামী সম্ভাবনার বাংলাদেশের কান্ডারী। তাদের হাত ধরেই বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাবে আমাদের সোনার বাংলা। তাই বিজয়ের মাসে সবার প্রাণে জেগে উঠুক দেশপ্রেম। কেননা, এই দেশ আমার, আপনার, সকলের।

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, নবীনকণ্ঠ

মুক্তিযুদ্ধে ইসলামপন্থিদের ভূমিকা

নুর আহমেদ সিদ্দিকী

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের অনেক ন্যারেটিভ বা বয়ান রয়েছে। ভারত এবং পাকিস্তান তাদের নিজস্ব দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাখ্যা করে। দুই দেশের ঐতিহাসিক গ্রন্থ বা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য পর্যালোচনা করলে তার স্বাদ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও মুক্তিযুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন বয়ান রয়েছে। ওই বয়ানগুলোর মধ্যে অনেক প্রভাবশালী বয়ানকারীরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ইসলামপন্থিদের প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করতে সর্বদা সচেষ্ট। এর কারণ হচ্ছে, ওই বয়ান যারা তৈরি করেছেন, তারা প্রায় সকলে বামপন্থি ঘরনার বুদ্ধিজীবী। ফলে তারা তাদের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য ইসলাম ধর্মকে তথা পুরো ইসলামপন্থাকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিপক্ষ শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছে। যদিও বামপন্থিদের একটি অংশও বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে সহায়তা করেছিল। কিন্তু একাত্তর পরবর্তী বুদ্ধিজীবীদের রচনা পড়লে মনে হবে যে, একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা কেবল ইসলামপন্থিরাই করেছে।

বামপন্থিদের পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করার বিষয়টি তারা সচেতনভাবে এড়িয়ে যান। অন্যদিকে কয়েকজন কট্টর বামপন্থি লেখক মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থিদের অবদান তুলে ধরতে গিয়ে অনেক মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী, চীনপন্থি, মুক্তিযুদ্ধকে 'দুই কুকুরের লড়াই' বলা সশস্ত্র বিপ্লবীদের কৌশলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করার প্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু সত্যিকারভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের মধ্যে বাম ও ডান, কট্টর বিরোধী ও ইসলামপন্থি উভয় ঘরানার লোকই ছিলেন। তারা বেশ সচেতনভাবেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও পাকিস্তান বাহিনীকে সহায়তা করেছেন।ইসলাম ধর্মকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করার ওই বয়ানের বিপরীতে

ইসলামপন্থিদের শক্তিশালী কোনো বয়ান নেই।

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বামপন্থিদের তেমন ভূমিকা না থাকলে স্বাধীনতা পরবর্তীতে ইতিহাস রচনায় মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদানের মিথ্যে গল্প সাজিয়েছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ইসলামপন্থিদের একটি পক্ষ বিরোধিতা করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ছিলো। তা সত্ত্বেও বামপন্থি সুশীল আর চেতনা ব্যবসায়ীরা ইসলাম, মুসলমান তথা ইসলামপন্থিদের সুকৌশলে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে দাঁড় করিয়েছে। মুছে দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে ইসলামপন্থিদের অবদানকে। মুক্তিযুদ্ধে হাজারো আলেম-ওলামার অংশগ্রহণ ছিল। আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ তাদের মাদরাসা ও খানকা মুক্তিযোদ্ধাদের থাকার স্থান হিসেবে ছেড়ে দিয়েছিল। বরিশালের চরমোনাইর পীর সৈয়দ ইসাহাক রহ তাঁর প্রতিষ্ঠিত চরমোনাই মাদরাসায় মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়েছিল। শত ত্যাগ আর অবদান থাকা সত্ত্বেও আলেমসমাজকে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে বামপন্থিরা।

১৯৪৭ সালে ভারতকে বিট্রিশদের বিতাড়িত করেছে আলেমসমাজ। সেই আজাদী আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ আলেম শহিদ হয়েছেন। আলেমসমাজের ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে পাকিস্তান ও ভারত পৃথক রাষ্ট্র হয়। আলেমসমাজের রক্তের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টি না হলে বাংলাদেশ সৃষ্টি হতো না। ভারত থেকে বিট্রিশদের বিতাড়িত করা এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম সবকিছুতেই ইসলামপন্থিদের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। শুধুমাত্র ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ দিয়ে ইসলামপন্থিদের যাচাই-বাছাই করলে ভুল হবে। ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলন, পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি, মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সর্বত্রই আলেমসমাজ তথা ইসলামপন্থিদের অবদান রয়েছে। সময়ের আবর্তে ইসলামপন্থিদের অবদানকে ছিনতাই করা হয়েছে।

২০২৪ সালে এসে জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে ইসলামপন্থিদের ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই আন্দোলনে ৭৮ জন আলেম ও মাদরাসার শিক্ষার্থী শহীদ হয়েছে। আহত হয়েছে সহস্রাধিক। ২৪-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা থাকলেও ইসলামপন্থিদের অবদানকে হাইলাইট করেনি মেইনস্ট্রিম মিডিয়াগুলো। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অবদানকে যেভাবে

ছিনতাই করা হয়েছে ঠিক তেমনি ২০২৪ সালে এসেও ইসলামপন্থিদের অবদানকে ছিনতাই করার ষড়যন্ত্র চলছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে যেমন বামপন্থিদের ভূমিকা ছিল না, ঠিক তেমনি ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানেও তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা নেই। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী যেমন ইসলামপন্থিরা ন্যারেটিভ বা শক্তিশালী বয়ান দাঁড় করাতে পারেনি ঠিক তেমনি ২০২৪ সালেও পারেনি।

মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। অথচ স্বাধীনতার চেতনা ব্যবসায়ী মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনাকে অস্বীকার করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছে। বিজয় দিবসে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্লোগান উঠুক। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের স্বৈরচারবিরোধী আন্দোলনকে অর্থবহ করতে বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই।

লেখক : সাংবাদিক ও সাহিত্যিক

শীত : মুমিনদের বসন্তকাল

আবদুর রশীদ

মহান আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত নেয়ামতে ভরপুর পুরো জাহান। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের অনন্য সৌন্দর্যে আবেগাপ্লুত হয় প্রতিটি হৃদয়। প্রতিটি দেশের বৈচিত্র্যের কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও দুটো দিক উল্লেখযোগ্য। একটি হলো গরম বা গ্রীষ্ম এবং অপরটি শীতকাল। ষড়ঋতুর এই দেশে প্রকৃতি বছরে ভিন্ন ভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়। অফুরন্ত এই নেয়ামত আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দান। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সূরা কুরাইশ পড়লে শীতকালীন গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। শীতকাল সম্পর্কে রয়েছে রাসূল (সা.)-এর অমিয় বাণী। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, শীতকাল হলো মুমিনদের বসন্তকাল। (মুসনাদে আহমদ)

শীতকালীন সময়ে প্রাপ্ত যে নেয়ামতগুলো উপভোগ করতে পারি

ইবাদতের বসন্তকাল :

শীতকাল হয় দীর্ঘ রাত আর সংক্ষিপ্ত দিন নিয়ে গঠিত। ফলে পর্যাপ্ত ঘুমের অতিরিক্ত হয়ে যায়। এজন্য রাতের শেষ ভাগে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা সহজ হয়। অপরদিকে দিন ছোট হওয়ায় রোজা রাখা সহজ হয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, শীতের রাত দীর্ঘ হওয়ায় মুমিন রাত্রিকালীন নফল নামাজ আদায় করতে পারে এবং দিন ছোট হওয়ায় মুমিন রোজা রাখতে পারে। (বায়হাকি)

দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.) বলেছেন, শীতকাল হলো মুমিনের জন্য গনিমত।

বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) শীতকালকে স্বাগত জানাতেন।

ইমাম গাজ্জালি (রহ.) বলতেন, শীতকালের চেয়ে প্রিয় কোনো সময় আছে কিনা আমার জানা নেই।

রাতের শেষভাগের নামাজ তাহাজ্জুদের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে সবারই জানা আছে। এই সময়কে লাইলাতুল কদরের সাথে তুলনা করা হয়। আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের অনন্য মাধ্যম। এ সময় আল্লাহ তায়ালা প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয় এবং তাঁর মুমিন বান্দাদের উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন, 'তোমাদের কেউ কি আছ ক্ষমাপ্রার্থী আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। কেউ কি আছ অভাবী আমি তার অভাব দূর

করে দেবো। কেউ কি আছ দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত আমি তাকে মুক্তি দেবো... এভাবে সুবহে সাদিক পর্যন্ত। অর্থাৎ, শেষ রাতের ইবাদত আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। অন্যদিকে দিন ছোট হওয়াতে কোনোরূপ কষ্টসাধ্য ছাড়া রোজা পালন সহজ হয়। এই জন্য বেশি বেশি রোজা রাখার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সহজ হয়। আর যাদের ফরজ রোজা ছুটে গেছে তাদের জন্য সেগুলো পূর্ণ করা একেবারে সহজ। সুতরাং শীতকাল হলো মুমিনদের জন্য এক বড় নেয়ামত।

মানবিক সেবা ও দায়িত্ব :

প্রতি বছর এই হাড় কাঁপা শীত অনেকের জন্য কষ্টসাধ্য। বাংলাদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর প্রায় অনেকের শীতবস্ত্র সংকট। ফলে অনেক কষ্টে রাত-দিন যাপন করতে হয়। এই সময় অসহায় দরিদ্রের পাশে দাঁড়ানো মানবিক ও ঈমানি দায়িত্ব। মানবিক সেবাকে ইসলামে অত্যন্ত মহৎ ও গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। নতুন কিংবা পুরাতন অথবা অব্যবহার্য পড়ে থাকা বস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা যে যার অবস্থান থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ করতে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এমন মানবসেবায় নিজেদেরকে শামিল করার একটি মহৎ সময় হলো এই শীতকাল।

ভ্রমণ ও বিনোদন :

শীতকালে ভ্রমণ হলো বাংলাদেশের এক অনবদ্য সংস্কৃতি। শীতের সময় প্রকৃতির নানা সাজ মানুষের হৃদয়কে উৎফুল্ল করে তোলে। প্রকৃতির এই মনোরম স্নিগ্ধতা উপভোগ করতে সবাই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছুটে যায়। মহান রবের এই বিশালতা, নৈপুণ্য ও সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখার মাধ্যমে নিজেদের ঈমানকে আরো দীপ্তময় করে তুলতে ভ্রমণ খুবই উপকারী। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনেও এই ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন।

ইসলামী কনফারেন্স :

শীতকাল আগমনের সাথে শুরু হয় দ্বীনের কনফারেন্স। ওয়াজ-মাহফিল হলো এই দেশের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। দ্বীনের কথা শুনতে মানুষ শীতকে উপেক্ষা করে থাকেন এবং দ্বীনের মাহফিলে উপস্থিত হন। এতে করে আরো বেশি মানুষের কাছে রবের কথা পৌঁছাতে থাকে। ফলে অনেকের জীবন পরিবর্তন হতে শুরু করে। তা ছাড়া বিশ্ব ইজতেমাও হয়ে থাকে শীতকালে। দ্বীনমুখী এই সংস্কৃতিগুলো শীতকালকে আরো বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।

সর্বোপরি, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে রবের দেওয়া এই শীত মৌসুমকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ঈমান-আমলকে আরো সুদৃঢ় করি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন!

তরুণ লেখক ও প্রাবন্ধিক
rsdrashid56@gmail.com

মানুষ মানুষের জন্য

রহমাতুল্লাহ শিহাব

কনকনে শীতে জবুথবু চারপাশ। দেশজুড়ে চলছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড। পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছে না অনেকেই। শীতের প্রকোপে অসহায় লোকজন মহা বিপাকে। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে সুবিধাবঞ্চিতরা হতবিহ্বল। তীব্র শীতে পোহাচ্ছে চরম দুর্ভোগ। হাসপাতালগুলোতেও বাড়ছে শীতজনিত রোগীর সংখ্যা। এদের পাশে দাঁড়ানো বিত্তবান ও সামর্থ্যবানদের কর্তব্য। নিজ নিজ দায়িত্ববোধ থেকে এগিয়ে আসা করণীয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা তাদের দান কর আল্লাহর সেই সম্পদ থেকে, যা তিনি তোমাদের দান করেছেন।' (সুরা নুর : ৩৩)। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, 'নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ ও নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়, তাদের বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।' (সুরা হাদিদ : ১৮)।

দানে মেলে দয়া ও প্রতিদান : শীতবস্ত্র, কম্বল, খাবার ও প্রয়োজনীয় ওষুধ তীব্র শীতে অসহায়ের শীত নিবারণে সহায়ক। তাই অসহায়, দরিদ্র, ছিন্নমূল মানুষদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। তাহলেই তাদের শীতের কষ্ট লাঘব হবে। আল্লাহর দেওয়া সম্পদ, বিদ্যা, শ্রম দিয়ে শীতার্ত ও দুর্গত মানুষদের সাহায্য করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে। রাসুল (সা.) বলেন, 'দয়াশীলদের ওপর করুণাময় আল্লাহ তায়ালা দয়া করেন। তোমরা দুনিয়াবাসীর ওপর দয়া কর, তাহলে যিনি আসমানে আছেন, তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।' (সুনানে আবু দাউদ : ৪৯৪১)।

দান জীবনের নিরাপত্তা :

শীতের পোশাক আছে, তবু শীত এলে নতুন পোশাক কিনি। সামর্থ্য থাকলে কিনতে দোষ নেই। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, হাড় কাঁপানো শীতে রাস্তায় অনেকে পোশাকের অভাবে বহুকষ্টে রাতযাপন করে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র এলাকার লোকদের দুর্দশা অবর্ণনীয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গা থেকে এদের জন্য সামান্য অর্থ বরাদ্দ রাখা চাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা দিনরাতে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন দান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। সুতরাং তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।' (সুরা বাকারা : ২৭৪)। আলোচ্য আয়াতে যারা সর্বাবস্থায় দান করে, তাদের জন্য অপরিমেয় পুরস্কার এবং পরকালে নিরাপদ নির্বিঘ্ন জীবনের ঘোষণা রয়েছে।

দাতার কল্যাণার্থে রবের প্রতিপালন :

বনি ইসরাইলের এক ব্যভিচারী নারীকে আল্লাহ তায়ালা শুধু একটি পিপাসিত কুকুরকে পানি পানের জন্য ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষের পাশে দাঁড়ালে, কেয়ামতের ভয়াবহ দিনে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দিতে পারেন। রাসুল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি হালাল অর্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সদকা করবে (আল্লাহ তা কবুল করেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র বস্তু কবুল করেন। আর আল্লাহ তাঁর ডান হাত দ্বারা তা কবুল করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ অশ্বশাবক প্রতিপালন করে থাকে। অবশেষে সেই সাদাকা পাহাড় সমপরিমাণ হয়ে যায়।' (বুখারি : ১৪১০)।

জেগে উঠুক সৃষ্টির প্রতি মমতা :

শীতের আগমনে ঘরে ঘরে পিঠা-পুলি খাওয়ার ধুম পড়েছে। শীতে আমরা

দেশ-বিদেশ ঘুরতে যাই। অথচ আশপাশের কত মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটায়! আমরা তার খবরও রাখি না। রাসুল (সা.) বলেন, কেয়ামত দিবসে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার শুশ্রূষা করোনি।' বান্দা বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি তো বিশ্বপালনকর্তা, কীভাবে আমি আপনার শুশ্রূষা করব?' তিনি বলবেন, 'তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, অথচ তাকে তুমি দেখতে যাওনি। তুমি কি জান না, যদি তুমি তার শুশ্রূষা করতে, তবে তুমি তার কাছেই আমাকে পেতে?' এরপর বলবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে আহার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে আহার করাওনি।' বান্দা বলবে, 'হে আমার রব! তুমি হলে বিশ্বপালনকর্তা, তোমাকে আমি কীভাবে আহার করাব?' তিনি বলবেন, 'তুমি কি জান না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিল, কিন্তু তাকে তুমি খাদ্য দাওনি। তুমি কি জান না, তুমি যদি তাকে আহার করাতে, তাহলে আজ তা প্রাপ্ত হতে।' এরপর বলবেন, 'হে আদম সন্তান! তোমার কাছে আমি পানীয় চেয়েছিলাম, অথচ তুমি আমাকে পানীয় দাওনি।' বান্দা বলবে, 'হে আমার রব! তুমি তো রাব্বুল আলামিন; তোমাকে আমি কীভাবে পান করাব?' তিনি বলবেন, 'তোমার কাছে আমার অমুক বান্দা পানি চেয়েছিল, কিন্তু তাকে তুমি পান করাওনি। তাকে যদি পান করাতে, তাহলে নিশ্চয় আজ তা প্রাপ্ত হতে।' (মুসলিম : ৬৭২১)।

বড়বাড়িয়া, চিতলমারী, বাগেরহাট

প্রকৃতির নানারূপ

ইয়াসিন আহসান

রৌদ্রদগ্ধ ধূসর ঘাসকেও যে পরম মমতায় ভালোবাসতে জানে তাকে প্রকৃত প্রকৃতিপ্রেমী বলা চলে। আলোয় সচল দিনটির মধ্যভাগে সূর্যমুখীর প্রবল চিত্তাকর্ষক মুখাবয়ব দেখে তো যে কেউ তার প্রেমে পড়বে। কিন্তু এই প্রেমকে শরতের শিশির ছাড়া অন্যকিছুতে আখ্যায়িত করতে আমি মোটেও রাজি নই।

সত্যনিষ্ঠ প্রকৃতিপ্রেমীর কাছে শীতের শুষ্কতায় শুকিয়ে যাওয়া নদীটির লিকলিকে কাঁদা মাটিও সমান গুরুত্ব বহন করে। কুয়াশাজড়ানো সকালের সজীব স্নিগ্ধতা তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। পত্রপল্লবহীন মেহগনি গাছকেও তার কাছে কখনোই প্রাণহীন কাষ্ঠখণ্ড মনে হয় না।

এমনভাবে কঁচি আমড়া পাতার সৌন্দর্য সৌষ্ঠবও তাকে তীব্র ভাবে কাছে টানে। জনহীন প্রান্তরে মিশমিশে কালো কাকের কর্কশ স্বর শোনবার জন্য মন তার আনচান করে। সবুজবীথি দিয়ে হেঁটে যাবার সময় তার কেবলই সবুজের সাথে সদ্ভাব জমাতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মেঠোপথের ধারে অযত্নে বেড়ে ওঠা জংলি ফুলটির গায়ে একবার হাত বুলিয়ে দিতে।

প্রকৃতির এই অসম্ভব রকমের রহস্যময়তার মাঝে আজন্ম ডুবে থাকার সাধ যার জাগে না সে প্রকৃতির কাছে সর্বদা আনকোরাই থেকে যাবে। সবুজ সমারোহের শীতল বাতাস, বুনো হরিণীর তটস্থ চকিত দৃষ্টি, এক পশলা বৃষ্টি শেষে মাটির সোঁদা গন্ধ, ঝিঁঝি পোকার দলবদ্ধ ক্লান্তিহীন বিশেষ শব্দতরঙ্গ, গেন্দাফুল কিংবা রাতজাগা হাসনাহেনার মাতাল করা সুবাস এসবই স্রষ্টার এক অপার মহিমা। অনন্য এক করুণা। এর আদ্যোপান্ত ধারণ করা প্রকৃতপক্ষেই এক দুরূহ ব্যাপার বটে। কেবল এক অরণ্য সৌন্দর্যের খুঁটিনাটি যদি কেউ পর্যবেক্ষণ করতে প্রবৃত্ত হয় তবে তার পুরো জীবনটুকুও যথেষ্ট হবে বলে বোধ হয় না। যার রহস্যবোধ আছে,আছে তীব্র পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিড়তার কাছে যদি জানতে চাওয়া হয় অরণ্যের অদেখা সৌন্দর্যের কথা, তবে সে নিশ্চিত খেই হারিয়ে অতল চিন্তাসমুদ্রে নিপতিত হবে।

অরণ্যের আগাগোড়া যেই সৌন্দর্যে মোড়ানো, তার বিশদ বর্ণনা হাজার গ্রন্থ ঘেটেও আত্মস্থ করা সম্ভব নয়। মুক্তোর দানার যে ঔজ্জ্বল্য মনুষ্যচক্ষু প্রথম দর্শনে প্রত্যক্ষ করে,তার বর্ণনা কখনোই কেউ ব্যক্ত করতে পারেনি। বরং অক্ষমতা বিশাল এক অশ্বত্থ বৃক্ষ হয়ে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরেছে।প্রকৃতির এক অরণ্যের অবস্থা যখন এই,তখন তার অন্যান্য উপাদানের ব্যাপকতা নিয়ে বাকচাতুরী করাকে কেবল বাতুলতা বলাই শ্রেয় হবে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে প্রকৃতির যে খণ্ড চিত্র মানুষ তার কথায় লেখায় ব্যবহার করে আসছে তা তার মূলের ধারের কাছেও নেই। প্রকৃতি তো অসীম। তার সৌন্দর্যকে কখনো কিছু দ্বারা বেঁধে রাখা যায় না। চিত্রায়ণ যতটুকু করা হয় তা কেবলই তার বহিরাংশের ক্ষুদ্রাংশ।

এতটুকুও সম্ভব কেবল নিগূঢ়ভাবে তার ভিতর ডুবে থাকলে। তার সাথে আত্মিক সম্পর্কের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনে ধ্যানমগ্ন হলে।যারা এটা পেরেছে তাদের বলা বা লেখাতেই প্রকৃতি যেন বারবার তার সব রূপ-যৌবন মেলে ধরে উদ্ভাসিত হয়েছে।

কিন্তু বরাবরের মতোই এই ধরাবাঁধা প্রকৃতির সান্নিধ্য পেয়ে মূলধারার প্রকৃতিপ্রেমীরা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাই তারা অনতিক্রম্য সব বাধা ডিঙিয়ে ছুটেছে পাহাড়, সমুদ্র, নদী আর বনজঙ্গলে। প্রকৃতির একান্ত নিবিড় অভয়ারণ্যে। এভাবেই তারা ছুটতে থাকবে দ্বিধাহীন মনে—প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনা সহকারে। প্রকৃতির সুখ সরোবরে অবগাহনের এই তো নিয়ম। এভাবেই কেবল খুব কাছ থেকে বড় সূক্ষ্ম ও সুচারুভাবে স্রষ্টার সৃষ্টি সৌন্দর্য আস্বাদন করা যায়।

শিক্ষার্থী, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ

‘বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব:

ইতিহাস, সংকট ও সমাধানের পথ’

● ইতাঙ্গীর খন্দকার

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে এই বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের এক অকল্পনীয় সূচনা হয়েছিল। এই কোম্পানি একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে, এ অঞ্চলের লোকদের শিক্ষিত করার তেমন কোনো প্রয়োজন অনুভব করেনি বললেই চলে। যতটুকু শিক্ষার প্রসার কিংবা প্রচার করেছে, ইতিহাসের আলোকে বলা যায়, তা নিজেদের স্বার্থকে রক্ষার তাগিদেই করেছে। শিক্ষার প্রসারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগ্রহ না থাকলেও ব্রিটিশ হিতবাদী, রাজনীতিবীদ, শিক্ষানুরাগী ও খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকের চাপের মুখে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলায় সুপরিকল্পিত শিক্ষা সম্প্রসারের মূল দু’টি উদ্দেশ্য ছিল—এক. সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সমর্থনপুষ্ট একটি বিশেষ মধ্যবিত্ত অভিজাত

শ্রেণি তৈরি করা। দুই. স্থানীয়দের মাঝে খ্রিষ্টধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটানো।

(১২০৪-১৭৫৭) এ অঞ্চলের একমাত্র অধিপতি ছিল মুসলিম শাসকরা, যারা জ্ঞানার্জনকে ইসলামি বিধান মোতাবেক পরকালীন পূণ্যের কাজ এবং মহান আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মনে করত। ফলে মুসলিম শাসনের সূচনালগ্ন থেকেই তারা জ্ঞানার্জনের প্রতি রাষ্টীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে এসেছিল। এ অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষার ন্যায় তিন স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল—এক. প্রাথমিক শিক্ষা। দুই. মাধ্যমিক শিক্ষা। তিন. উচ্চশিক্ষা। এ সকল শিক্ষাব্যবস্থা মসজিদ এবং মন্দির কেন্দ্রিক গড়ে উঠে ছিল। মুসলমানদের জন্য মাদরাসা এবং হিন্দুদের জন্য ছিল পাঠশালা। উক্ত শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান শিক্ষা ছিল নৈতিকতা ও স্ব স্ব ধর্মের প্রতি গুরুত্বারোপ করা। ইতিহাসের আলোকে আমরা এই মর্মে জানতে পারি যে, কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদী শাসনের দ্বারা এ দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

ইমাম গাজালি পুরোনো জরাজীর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করেন এবং একটি নতুন শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা পেশ করেন। মুসলিমদের মধ্যে যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ছিল, তার মধ্যে দুধরনের ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছিল। প্রথমটি হলো—দ্বীনি ও দুনিয়াবি শিক্ষাব্যবস্থা পৃথক ছিল। এর ফলস্বরূপ দিন ও দুনিয়ার মধ্যে পৃথকীকরণ দেখা দেয়। ইসলাম এটিকে ভ্রান্ত মনে করে। দ্বিতীয়টি হলো—শরিয়তের জ্ঞান হিসাবে এমন অনেক বিষয় পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

এর ফলে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জনগণের ধারণা ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং কতিপয় অপ্রয়োজনীয় বিষয় গুরুত্ব অর্জন করার কারণে ফিরকাগত বিরোধ শুরু হয়। ইমাম গাজালি এ গলদগুলো দূর করে একটি সুসামঞ্জস্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন।

কোম্পানি ১৬৯৮ সালে সনদ আইনের মাধ্যমে খ্রিষ্টান পাদরিদের দ্বারা খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে বাংলায় আনুষ্ঠানিকভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা করে। এজন্য এ অঞ্চলের বড়ো বড়ো শহরে মিশনারীদের নেতৃত্বে মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় যেমন—'Society of Promoting christian knowledge'-এর আওতায় ১৭৩১ সালে প্রথম ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে তৎকালীন ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং খ্রিষ্টধর্মের প্রচার করা হতো। নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তৎকালীন কোম্পানির শাসক ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ সালে কলিকাতা মাদরাসা, উইলিয়াম জোনস ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি, জোনাথান ডানকান ১৭৯১ সালে বেনারসে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবের পর শ্রমিকেরা মারাত্মকভাবে শিক্ষাহীনতায় ভুগছিল, যার ফলে তৈরি হয় সভ্যতাগত সংকট, জ্ঞানের

প্রকৃত আলো না থাকায় ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণিতে বিভাজিত হয়ে অধিকারের সাবলীল কণ্ঠ ধারণ করা ছিল অলীক স্বপ্নের মতো। চাইলেই তারা প্রথাগত রীতি-নীতির বাইরে যেতে পারত না। পরিশেষে তাদেরকে শিক্ষিত করার জন্যে কিছু বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যেমন-Sunday School Union (১৮০৩), Royal Lancastrian Institution (১৮০৮) ইত্যাদি।

এ সময় সংস্কারবাদী Samuel Whitbread ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষে (House Of Commons) ৭-১৪ বছরের শিশুদের বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের জন্য স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন ১৮০৭ সালে, তবে তা উচ্চ কক্ষে বাদ পড়ে যায়। এক্ষেত্রে বলা যায় সমসাময়িক অনেক ব্যক্তিই এমন প্রস্তাব দিয়েছিলেন নিম্ন কক্ষ থেকে উচ্চ কক্ষে, তবে তাদের সব প্রস্তাব বাতিল হলেও প্রস্তাবের প্রায় ২০ বছর পর Cort of Directors'দের এই অঞ্চলের লোকদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করাকে দায়িত্ব মনে করেন নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই, কীভাবে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাতে প্রগতিশীলতার মোড়কে লক্ষ লক্ষ বেকার তৈরি করা হয়েছে, মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকেও আমরা দেখি পাশ্চাত্যকরণ নীতির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নানা বিতর্কিত বিষয়গুলো দিয়ে সমাজে তৈরি করা হচ্ছে মতানৈক্য এবং ইসলাম বিদ্বেষী ছাত্র-ছাত্রী সমাজ। বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ কেন উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী নয়; এর উত্তর কী হতে পারে? পাগলের জট-পাকানো চুলের মতো এই যে আমাদের জট পাকানো শিক্ষাব্যবস্থা, এর পেছনের কারণ খতিয়ে দেখারও প্রয়োজন আছে। ক্ষমতাসীনদের কেন এই জট খোলার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ থাকে না, বরং জট আরও বেশি করে পাকান? জাতি শিক্ষা-দীক্ষায় দুর্বল হলে একচ্ছত্র ক্ষমতালোভী ক্ষমতাসীনদের যে লাভ হয়, সেটা একটা প্রমাণিত সত্য।

এটা বোঝার জন্য একজন রকেট সায়েন্টিস্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই। বিলাতে ১৯৮৮ সালে সংবিধিবদ্ধ জাতীয় কারিকুলাম চালু করা হয়। এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো, সব শিক্ষার্থীর জন্য একই পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা, যাতে করে শিক্ষাকালীন কোনো ধরনের বৈষম্য কিংবা অসামঞ্জস্যতা না থাকে। জাতীয় পাঠ্যক্রমটি শিক্ষার্থীদের মূল জ্ঞানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, যা তাদের শিক্ষিত নাগরিক হওয়ার জন্য অপরিহার্য। এর লক্ষ্য হলো, কঠোরভাবে শিক্ষার উচ্চমানকে বাস্তবিক রূপ দান করা। বাস্তব দুনিয়া আর স্কুলে যা শেখানো হয়, তার মধ্যে একটা যোগাযোগ স্থাপন করা। সর্বোপরি এটা নিশ্চিত করা যে, সমস্ত শিশুকে মূল বিষয়গুলোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান হাতে-কলমে শেখানো হচ্ছে।

শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থার আদলে শিক্ষাকে সাজাতে গেলে আমরা তামাশার বস্তুতে রূপান্তরিত হবো; হবো নব্য উপিনিবেশবাদের নয়া পুতুল। দেশীয় ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির যোগসাজশ না থাকলে শুধু পাশ্চাত্যের শিক্ষার আধুনিক মোড়কে নিজেদের সঁপে দিলে আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি কখনো জাগ্রত হবে না। শির উঁচু করে নিজের দেশকে বহির্বিশ্বে তুলে ধরতে ব্যর্থ হবো। চাপানো কিছু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সৃষ্টির আনন্দে জীবন' দান করতে পারে না, ঠিক যেমন পারে না 'মনের মধ্যে ঘা' দিতে। ১৮৩৫ সালের মেকেলের মিনিটের মতো কেরানি বানানোর কেরামতি দেখানো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজ নয়।

আমদানি-নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা ও নীতি দিয়ে আমরা বেশিদূর এগোতে পারব না। নিজেদের ভূমি, মানুষ ও সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি ও দাবিকে সামনে রেখেই সাজাতে হবে শিক্ষার রূপকল্প, যা প্রথমে নিজস্ব দেশজ বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকেও যাতে ধরে ফেলতে পারে ক্রমান্বয়ে। এজন্য নিজস্ব ভাষায় বিদ্যা দান, বই রচনা এবং এর পাঠ ও পঠন জরুরি। নিজস্ব ভাষায় বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের উৎকর্ষ হয় ফল্গুধারার মতো—তা মাথায় না রাখলে জাতি বেশি দূর এগোতে পারবে না।

১৮৭৪ সালে জার্মান দার্শনিক কান্ট 'এনলাইটমেন্ট' বা আলোকায়নের কথা বলেন। সেই সূত্র ধরে কিছু বলতে গেলে বলতে হবে, শিক্ষা নিজের আত্মাকে জাগায় পরাধীনতার শিকল ভাঙার গল্প বলে বলে। নিজেদের উন্নত মানুষ, জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্যই সবার কল্যাণে শিক্ষার বিস্তার করতে হবে এবং টেকসই ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।

শিক্ষার্থী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীন মানচিত্রে শকুনের থাবা;

পরাধীনতার রোজনামচা

ওমর ইবনে আখতার

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি মহাকাব্যিক সংগ্রাম, যা দেশের জনগণের আত্মত্যাগ ও স্বাধীনচেতা মানসিকতার প্রতিফলন। তবে এই সংগ্রামটি একমাত্র পাকিস্তান বা তার সামরিক শাসনের বিরুদ্ধেই ছিল না; এর পেছনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শক্তির সক্রিয় হস্তক্ষেপও লক্ষণীয়। বিশেষ করে ভারতের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যদিও খোলা চোখে দেখলে ভারতকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি মনে হয়, কিন্তু অনুসন্ধিৎসু তথ্যমতে এই

যুদ্ধের পেছনে ছিল ভারতের বৃহৎ রাজনৈতিক হীনস্বার্থ। যা প্রভাবিত করেছিল দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অবস্থানকে।

এক.

আধিপত্যবাদী রাষ্ট্র ভারত, উপমহাদেশের প্রতিটি স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্য হুমকিস্বরূপ। আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন রাষ্ট্রটির জন্মলগ্ন থেকেই পাক ভূখণ্ডের সাথে ছিল বৈরী সম্পর্ক। কেননা অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কখনোই মেনে নিতে পারেনি ১৯৪৭-এর দেশ ভাগকে। তাই সর্বদা অখণ্ড ভারতের স্বপ্নে বিভোর ছিল হিন্দুত্ববাদী এই গোষ্ঠীটি।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহার লাল নেহেরু তার Discovery of India গ্রন্থে 'অখণ্ড ভারত'-এর রূপরেখা প্রণয়ন করেন। যা India Doctrine নামে কুখ্যাত। এর মূল কথা হচ্ছে—'উপমহাদেশে ভারতই হবে মূল শক্তি, চালক বা নীতিনির্ধারক। এখানে অন্য কোনো দেশ পারবে না স্বাধীনভাবে নিজেদের নীতিনির্ধারণ করতে। অন্য কোনো বহিঃশক্তি উপমহাদেশের কোনো রাষ্ট্রকে ভারতের ছাড়পত্র ছাড়া পারবে না কোনো বিষয়ে সাহায্য, সহযোগিতা কিংবা চুক্তি করতে। স্থানীয় সকল দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রকেই চলতে হবে ভারতীয় মর্জিমাফিক। এই India Doctrine হাসিলের জন্য ভারত বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ভারতের একটি সফল চাল ছিল ৭১'এর স্বাধীনতাযুদ্ধ। ইংরেজ পরবর্তী হিন্দুস্তানে ভারতের সিকিম, হায়দারাবাদ, গোয়া ও কাশ্মীরসহ একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রে অবৈধ দখলদারিত্ব ছিল গেরুয়া সন্ত্রাসদের অখণ্ড ভারত মনোবাসনার প্রাথমিক ধাপ। আর এর গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি ধাপ ছিল বাংলা ভূমিকে পাকিস্তানের বলয় থেকে মুক্ত করে নিজেদের করদ-রাজ্যে পরিণত করা। যাতে তার আগ্রাসী পদক্ষেপ থাকে পাকিস্তানের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ। এবং স্বপ্নের অখণ্ড ভারত নির্মাণের পথে বাংলা যেন পালন করে তাদের উপপত্নীর ভূমিকা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ১৯৪৮ সালের পরবর্তী সময়ে ভারত নিজেদের ষড়যন্ত্রের ছক কষে।

ফলে একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের একের পর এক আগ্রাসী পদক্ষেপ, স্বৈরশাসন, পূর্বপাকিস্তানীদের সাথে দাসত্বের আচরণসহ তাদের মূর্খতাসূলভ নানা স্বৈরাচারী ও নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড এ দেশের জনমনে তৈরি করে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা। অপরদিকে ভারতের নিরবচ্ছিন্ন ষড়যন্ত্র ও উসকানি গণমানুষের মাঝে তৈরি করে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। যার ফলে অতি সাধারণ একটি ইস্যুকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয় ৫২'র ভাষা আন্দোলন। যা বিশ্বে ভাষার জন্য একমাত্র রক্তক্ষয়ী প্রাণনাশী আন্দোলন হিসেবে খ্যাত। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে ৬৯'এর গণঅভ্যুত্থান ও চূড়ান্ত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ৭১'এর স্বাধীনতা সংগ্রাম। যার পরিণতিতে একটি

স্বাধীন ভূখণ্ড হয় দ্বিখণ্ডিত। একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রকে বরণ করতে হয় চূড়ান্ত বিপর্যয়। এর জন্য দায়ী যেমন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর জুলুম, নিপীড়ন ও মূর্খতাসূলভ বিভিন্ন পদক্ষেপ, তেমনিভাবে দায়ী হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র ভারতের অবৈধ মনোবাসনা ও রাজনৈতিক চক্রান্ত। যা স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের সাথে ভারতীয় আচরণ থেকে খুব সহজেই অনুমেয়। আমরা দেখতে পাই কীভাবে একটি স্বাধীন ভূখণ্ডকে নিজেদের প্রয়োজনে যথেচ্ছা ব্যবহার করে যাচ্ছে বন্ধু নামের এই উপমহাদেশীয় ইজরাইল। কীভাবে স্বাধীনতার নামে পরাধীনতার শিকল পরিয়ে দিয়েছে একটি স্বাধীন ভূখণ্ডকে। আশা করি সামনের আলোচনা থেকে পাঠকের সামনে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

দুই.

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই রচিত হয় বাংলার বুকে ভারতীয় আধিপত্য, আগ্রাসন, নিপীড়ন ও স্বেচ্ছাচারীর চূড়ান্ত খসড়া। মূলত স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থন দেওয়াকে পুঁজি করে স্বাধীনতার পরপরই ভারত বাংলাদেশকে বানায় অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্র। বিশেষ করে যুদ্ধে পরাজিত পাক-বাহিনীর ফেলে যাওয়া প্রায় ৬০,০০০ কোটি রুপী মূল্যমানের অস্ত্র-শস্ত্র ভারতীয় সৈন্যরা লুণ্ঠন করে বিনা বাধায়। এ ছাড়া যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের শিল্পস্থাপনা, কলকারখানা, পুল, ব্রীজ ইত্যাদির লোহা, কল-কব্জা ও নাট-বল্টু পর্যন্ত লুটে নেয় হিন্দুত্ববাদী এই দেশটির সৈন্যরা। এখানেই শেষ নয়, ভারতীয় বাহিনীর এ লুটপাটে বাধা দেওয়ায় মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর এম. এ. জলিলকে গ্রেফতারির নির্দেশ দেয় ভারত সরকার।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় জেগে ওঠা দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ একতরফাভাবে জোরপূর্বক দখল করে নেয় ভারত। ১৯৭৪ সালের ১৬ই মে 'ইন্দিরা-মুজিব সীমান্ত চুক্তি'র মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশাল ছিটমহল বেরুবাড়ির দখলও চিরতরে নিয়ে নেয় ভারত। বেরুবাড়ির বিনিময়ে বাংলাদেশকে তিন বিঘা করিডর হস্তান্তর করার কথা থাকলেও অদ্যাবধি তা বাস্তবায়ন করেনি হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রটি। ফলে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতার অধিবাসীদের মূল ভূখণ্ডে যাতায়াতের জন্য নির্ভর করতে হচ্ছে ভারতীয় অনুগ্রহের উপর।

তিন.

ফারাক্কা বাঁধ। বহুল আলোচিত সমালোচিত একটি প্রকল্প এই ফারাক্কা। যা বাংলাদেশে ভারতীয় পানি সন্ত্রাসের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার। এটি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সৃষ্টি করেছে মারাত্মক পরিবেশগত বিপর্যয়। প্রতি বছর এই বাঁধের পানিতে তলিয়ে যায় দেশের বেশ কয়েকটি জেলা। ক্ষতি হয় হাজার কোটি টাকার। এ ছাড়া

ভারতের একতরফা গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের কারণে বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন ও পরিবেশ পড়েছে গুরুতর হুমকির মুখে। অথচ ১৯৯৬ সালে গঙ্গার পানি বণ্টন নিয়ে চুক্তি হলেও তা বাস্তবায়নে রয়েছে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা। বলা চলে চুক্তি এখনও চুক্তিতেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবায়ন এখনও স্বপ্নের বিষয়।

চার.

সীমান্তে ভারতীয় সেনা সন্ত্রাস। বিএসএফের (ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী) হামলা ও হত্যাযজ্ঞের ঘটনা কোনো অনিয়মিত বিষয় নয়। ২০০৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী স্বাধীনতার পর থেকে সীমান্তে মারা পড়ে ৭০১ বাংলাদেশী। যাদের ৬৫৩জনই নিহত হয় বিএসএফের গুলিতে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বাঙালি হত্যা এখন ভারতের কাছে দুধভাত। পাখির মতো গুলি করে কারণে অকারণে অন্যায়ভাবে হত্যাকরে বাংলা মায়ের নিরীহ সন্তানদের। নিজেদের পৈশাচিক মনোবাসনা মেটায় বন্ধু নামক শত্রু দেশটির প্রহরীরা। ফেলানি হত্যা কিংবা সম্প্রতি মিষ্টির বিনিময়ে লাশ হস্তান্তরের ঘটনা তারই সাক্ষ্য বহন করে। অথচ স্বাধীনতা পূর্ব ২২ বছরে সীমান্ত হত্যা ছিল শূন্যের কোটায়। আর স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে হাজারো বাঙালির রক্তে সীমান্ত রঞ্জিত হলেও ভারত এর জবাবদিহিটুকু দেওয়ারও প্রয়োজনবোধ করেনি।

পাঁচ.

বাংলাদেশে ভারতীয় রাজনৈতিক আগ্রাসন। ভারতীয় গোয়েন্দা এজেন্ট 'র'-এর মাধ্যমে স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ চালিয়ে আসছে ভারত। বাংলাকে অশান্ত রাখতে তারা সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মুজিববাদী সরকারের পতন ঘটলে বাংলাদেশকে পুনরায় ভারতীয় বলয়ে নিয়ে আসতে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে একই বছরে (১৯৭৫) একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা চালায়। এজন্য বাঘা সিদ্দিকী খ্যাত কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ১০/১৫ হাজার সদস্যের একটি কাদেরিয়া বাহিনী গঠন করে ভারত থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশের সীমান্তে হামলা চালায়। এতে কয়েকশ সেনাবাহিনীর সদস্য ও বহুসংখ্যক বাংলাদেশি নিহত ও আহত হয়। এ ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে 'শান্তি বাহিনী' গঠনের মাধ্যমে উপজাতীয় তরুণদের উসকিয়ে দিয়ে বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী এক অপতৎপরতার জন্ম দিয়েছে আগ্রাসী ভারত। এই শান্তি বাহিনীর হাতে এ যাবৎ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিডিআর, বিজিবি, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যসহ নিহত ও আহত হয়েছে প্রায় ১০ হাজার বাংলাদেশি।

স্বাধীনতার ঘোষক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পেছনেও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (Raw)-এর গোপন হাত

ছিল বলে ধারণা করেন বহু রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

বাংলাদেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা, সামাজিক বিভাজন সৃষ্টির ক্ষেত্রেও ভারত (Raw)-এর মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে অত্যন্ত নিপুণভাবে। এজন্য ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি (ঘাদানিক) গঠন, দেওয়ানবাগ দরবার, কাদিয়ানি ফেতনা, হাককানী মিশন, প্রভৃতি ধর্মীয় সংঘাত ও অপচক্র সৃষ্টির পেছনে ভারতের ভূমিকা সুস্পষ্ট। গণ আদালত গঠন এবং মুক্তিযোদ্ধা অমুক্তিযোদ্ধা বিভাজন সৃষ্টির মাধ্যমে জাতিকে বিভক্তিকরণ ও দুর্বল করার চক্রান্তে লিপ্ত ভারত। তসলিমা নাসরিন, দাউদ হায়দার, সরদার আলাউদ্দিন, হাসান ইমাম, আরজ মাতুব্বর কিংবা ডেইলি স্টার বা প্রথম আলোগংদের পেছনে সুপরিকল্পিতভাবে অর্থ ব্যয় ও শক্তির জোগান দেয় এই দেশটিই। সবশেষে ইসকন, এ দেশে ভারতীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার। হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র কায়েমের অগ্রণী সেনা।

ছয়.

আমরা কিংবা বিশ্ব **১৯৭১**-এর যুদ্ধকে বাংলাদেশ-পাকিস্তান স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে জানলেও ভারত এটাকে পাক-ভারত ঐতিহাসিক যুদ্ধ হিসেবে জানে কিংবা ব্যক্ত করে। যা উল্লেখ আছে তাদের অফিসিয়াল কাগজে কলমে, এমনকি তাদের পাঠ্যপুস্তকেও। আসাম, কলকাতাসহ সমগ্র ভারতের স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে বাংলাদেশের এই সংগ্রামকে পাক-ভারতীয় যুদ্ধ হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। যা সম্প্রতি উঠে এসেছে বিবিসি বাংলার একটি ডকুমেন্টারিতে। এ ছাড়া স্বাধীনতা সনদে ভারতীয় সেনাপ্রধানের স্বাক্ষর, বাংলাদেশি জেনারেলদের অনুপস্থিতিও জোরালো করেছে হিন্দুত্ববাদের এই দাবিকে।

সাত.

১৯৭১ সালে ভারতের মূল উদ্দেশ্য ছিল, পাকিস্তানকে দুর্বল করে এবং বাংলাদেশকে তাদের আশ্রয়ে এনে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। তাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনারা ‘অপারেশন স্ট্রাইক’ নামে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে। ভারতীয় সেনারা বাংলাদেশে প্রবেশ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সহজতর হলেও ভারতের সামরিক এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে চলে যায় এই ভূখণ্ডটি।

সুতরাং আমরা বলতেই পারি, ভারতের ইচ্ছা একটি দেশকে জুলুম ও শোষণ থেকে মুক্ত করা ছিল না, বরং ছিল বাংলাদেশকে নিজের প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত করা এবং পাকিস্তানকে উপমহাদেশে শক্তি ভারসাম্যে দুর্বল করে দেওয়া। এক্ষেত্রে

ভারতের সামরিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল— বাংলাদেশকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে দেশটি ভারতের বাইরে কোনো স্বাধীন আন্তর্জাতিক অবস্থান নিতে না পারে। এবং পরাধীনতার শিকলে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ হয়ে যায়। যার ফলে বহুকাল যাবৎ বিভিন্ন দেশীয় দেশপ্রেমী শক্তিগুলো ভারতের আগ্রাসন থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেও ব্যর্থ হচ্ছে পরাধীনতার শিকল চূর্ণ করতে।

তথ্যসূত্র-

১। ইন্দিরা-মুজিব সীমান্ত চুক্তি (১৯৭৪); ভারত ও বাংলাদেশ।

২। ফারাক্কা ব্যারেজ এবং এর পরিবেশগত প্রভাব; জার্নাল অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ ১৯৯৮।

৩। ভারতের জল যুদ্ধ, দক্ষিণ এশিয়ায় সম্পদের লড়াই; নন্দিনী সুন্দর (২০১১)

৪। গঙ্গা জল ভাগাভাগি চুক্তি, ১৯৯৬ ইং। আন্তর্জাতিক জল চুক্তি সম্পর্কিত জাতিসংঘের প্রতিবেদন।

৫। দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তঃসীমান্ত জলপথের ভারতের কৌশলগত ব্যবহার; এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক ২০১০ইং।

৬। The Bangladesh Liberation War: A Historical Perspective, History Journal, ২০০৫.

৭। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে RAW-এর ভূমিকা, আন্তর্জাতিক রাজনীতি পর্যালোচনা, ২০১০ইং।

৮। UNCLOS এবং মেরিটাইম বাউন্ডারি ডিলিমিটেশন: South Asia Perspective, International Maritime Law Journal, ২০১৫.

৯। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে হত্যা: উইকিপিডিয়া।

১০। somewhereinblog.net

১১। ভারতীয় পাঠ্যপুস্তকে ৭১'এর স্বাধীনতা যুদ্ধ; বিবিসি বাংলা ৩ ডিসেম্বর ২০২০ইং।

১২। The Daily Star Bangla; বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে হত্যা; ১৯ জানুয়ারি ২০২০ইং।

(একটি অনুসন্ধানী ডকুমেন্টারি)

পূর্ব জাজিরা, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

রাজধানী ঢাকার আদ্যোপান্ত

হৃদয় পান্ডে

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী, এক ঐতিহাসিক শহর; যার জাঁকজমকপূর্ণ অতীত এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ঝলক আজও স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে যখন এই শহরের বিকাশ ঘটেছিল, তখন থেকেই ঢাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। মুঘল আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ঢাকার ইতিহাসের ধারাবাহিক পরিবর্তন এবং উন্নতির সাথে শহরের ঐতিহ্য বহমান রয়েছে। ঢাকার ঐতিহ্যের যাত্রা শুধু স্থাপত্যশৈলী ও সংস্কৃতির বিবর্তন নয়; বরং এটি একটি জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রতিফলন।

মুঘল আমলে ঢাকার উত্থান

১৬০৮ সালে যখন ঢাকাকে মুঘল প্রশাসনের অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তখন থেকেই

এই শহরের স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। মুঘলরা ঢাকাকে তাদের পূর্বাঞ্চলীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। মুঘল আমলে ঢাকার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এর সমৃদ্ধ বাণিজ্যব্যবস্থা এবং কারুশিল্প, বিশেষত ঢাকাই মসলিনের উৎপাদন, যা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল। মসলিন কাপড়ের সূক্ষ্মতা এবং সৌন্দর্যের কারণে ঢাকার নাম সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। 'মসলিনের শহর' নামে খ্যাত এই ঢাকা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বণিকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

মুঘল আমলে ঢাকায় যে ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যশৈলীর বিকাশ ঘটেছিল, তা আজও শহরের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে রয়ে গেছে। লালবাগ কেল্লা, হাজারীবাগ এবং বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত বিভিন্ন মসজিদ ও মন্দিরগুলো আজও মুঘল স্থাপত্যের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। বিশেষ করে লালবাগ কেল্লা, যেটি মুঘল আমলের অন্যতম সুন্দর একটি স্থাপনা, তা আজও ঢাকার ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। শহরের ভেতরের এই কেল্লাটি মুঘল সাম্রাজ্যের শেষদিকে নবাব শায়েস্তা খানের অধীনে নির্মিত হয়েছিল এবং এখনও এটি পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান।

ব্রিটিশ শাসন ঢাকার এক নতুন রূপান্তর

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে পরাজয়ের পর বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের সূচনা ঘটে, যা ঢাকার সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক কাঠামোতে অনেক পরিবর্তন আনে। ব্রিটিশ আমলে ঢাকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেকাংশে হ্রাস পায় এবং মসলিন শিল্প ধ্বংস হতে শুরু করে। ঢাকাই মসলিনের উৎপাদন এবং ব্যবসা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। তবে এই সময়ে নতুন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল এবং বিভিন্ন সরকারি স্থাপনা গড়ে ওঠে, যা ঢাকার আধুনিকতার দিকে অগ্রগতির সূচনা করে।

ব্রিটিশ শাসনামলে ঢাকার অবকাঠামো এবং শহর পরিকল্পনার পরিবর্তন দেখা যায়। শহরে পশ্চিমা স্থাপত্যের প্রভাব পড়তে শুরু করে এবং ঢাকার রাস্তাঘাট, ভবন এবং অন্যান্য অবকাঠামোতে নতুনত্ব দেখা যায়। এই সময়ে গড়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যা দেশের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তৎকালীন ঢাকা শহরে উদ্ভূত নবজাগরণ ঢাকার মানুষের রাজনৈতিক এবং সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে সহায়ক হয়। ঢাকার ঐতিহ্যের উপর ব্রিটিশ স্থাপত্যের প্রভাব, যেমনঃ কার্জন হল, আহসান মঞ্জিল এবং অন্যান্য স্থাপত্য নিদর্শন, যা আজও শহরের বিভিন্ন অংশে দৃষ্টিগোচর হয়।

পাকিস্তান আমল ঢাকার পুনর্জন্মের সূচনা

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর ভারতীয় উপমহাদেশ ভাগ হয়ে বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান নামে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময় ঢাকার আবার একটি নতুন পরিচিতি লাভ করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে তা

গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সময়ে, শহরে নতুন প্রশাসনিক ভবন এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ শুরু হয়। পাকিস্তান আমলে ঢাকা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে, যেখানে বাংলাভাষা এবং জাতীয় ঐতিহ্যের ওপর জোর দেওয়া হয়।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে ঢাকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা এবং জাতীয়তার প্রতি মানুষের আবেগ ও আত্মত্যাগ ঢাকাকে একটি ঐতিহাসিক শহর হিসেবে নতুনভাবে গড়ে তোলে। ভাষা আন্দোলনের পর ঢাকার সংস্কৃতিতে নতুনভাবে গণতান্ত্রিক চেতনা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। একে কেন্দ্র করেই স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের পথ প্রশস্ত হয়।

মুক্তিযুদ্ধ এবং ঢাকার পুনর্জন্ম

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ঢাকায় শুরু হয় এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। **২৬শে** মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে পুরো বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এবং রাজপথে এই যুদ্ধের চিহ্ন বহন করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ এবং মুক্তিযোদ্ধারা একত্রিত হয়ে যে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, তা ঐতিহাসিক সংগ্রাম এবং বীরত্বের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। **১৬ই** ডিসেম্বর **১৯৭১**-এ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

স্বাধীনতার পর ঢাকাকে বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এটি নতুন রূপে উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই শহরে এখনও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থান রয়েছে, যেমনঃ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, যেখান থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল এবং শহিদ মিনার, যেখানে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকার এই স্মৃতিসৌধগুলো আজও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনার প্রতীক এবং প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে গভীরভাবে গাঁথা।

আধুনিক ঢাকা একটি কসমোপলিটন শহর

স্বাধীনতার পর থেকে ঢাকা এক নতুন গতি ও প্রকৃতিতে পরিবর্তিত হয়েছে। **১৯৭১** পরবর্তী সময়ে এই শহরকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। বর্তমান ঢাকা একটি কসমোপলিটন শহরের রূপ ধারণ করেছে, যেখানে দেশের প্রধান অর্থনৈতিক কার্যক্রম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যালয় স্থাপিত

হয়েছে। তবে ঢাকার সাম্প্রতিক উন্নয়নের পথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জ এবং নগরায়ণের কারণে পরিবেশের উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে।

শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যানজট এবং দূষণের মতো সমস্যাগুলোর পাশাপাশি ঢাকার স্থাপত্যেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আধুনিক আকাশচুম্বী ভবন, শপিংমল এবং বহুজাতিক হোটেলগুলো শহরের আকাশরেখাকে রূপান্তরিত করেছে। বর্তমানে শহরে রয়েছে বিশ্বমানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল। ঢাকা আজ দেশের উন্নয়নের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত, যেখানে নতুন সুযোগ এবং সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই আধুনিকায়নের মধ্যেও ঢাকার ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য ও সংস্কৃতি

ঢাকার ঐতিহ্যের বড়ো একটি অংশ হলো এর প্রাচীন স্থাপত্য। লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিল, হোসেনী দালান, কার্জন হল, এবং বড়ো কাটরা ও ছোটো কাটরা মুঘল ও ব্রিটিশ শাসনামলের স্থাপত্যের নিদর্শন। এই স্থাপনাগুলো আমাদের অতীত ঐতিহ্যের একটি ধারক এবং এটি আজও হাজারো পর্যটককে আকর্ষণ করে। ঢাকার স্থাপত্যশৈলী কেবল সৌন্দর্যের নিদর্শন নয়; বরং এটি ইতিহাসের এক চলমান ধারাবাহিকতা, যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হলেও তার মূল চেতনাকে আজও ধরে রেখেছে।

অন্যদিকে ঢাকার ঐতিহ্যের অন্য বড়ো একটি অংশজুড়ে রয়েছে এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে আসছে। পুরান ঢাকার বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী উৎসব এবং অনুষ্ঠান ঢাকার সংস্কৃতির প্রাণ। চৈত্রসংক্রান্তি, ঈদ, পূজা এবং বিয়ের মতো অনুষ্ঠানগুলোতে পুরান ঢাকার মানুষের ঐতিহ্যবাহী আচার-আচরণ আজও রয়ে গেছে। এখানকার খাজা, কাবাব, বাখরখানি এবং পুরান ঢাকার রাস্তায় গন্ধে মাখামাখি নানান ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলো বাংলাদেশের খাদ্যসংস্কৃতিতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। প্রতি বছর পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা ঢাকার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অন্যতম প্রতীক হয়ে উঠেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আয়োজিত এই শোভাযাত্রায় সারা দেশ থেকে লাখো মানুষ অংশ নেন। এটি এখন ইউনেসকো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য এবং কৃষ্টির এক অনন্য উদাহরণ।

ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন

যদিও ঢাকা শহর তার ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে গর্বের সাথে ধারণ করে, তবে আধুনিক যুগের নগরায়ণ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি শহরের জন্য একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দ্রুত নগরায়ণের ফলে ঢাকার পুরাতন ঐতিহ্যবাহী ভবন ও স্থাপনাগুলো হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক স্থাপনা সংরক্ষণ না করতে পারায় তা বিলুপ্তির পথে চলে গেছে বা আধুনিক ভবনের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশগত দিক থেকেও ঢাকা শহর আজ দূষণ, যানজট, এবং অন্যান্য সমস্যায় জর্জরিত। তবে আশার কথা হলো, সরকারের পাশাপাশি অনেক বেসরকারি উদ্যোগ এবং সচেতন নাগরিকরা এই ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোর সংরক্ষণে কাজ করছেন। বর্তমানে বেশ কিছু সংরক্ষণ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, যা ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাগুলোকে সংরক্ষণ এবং পুনর্নির্মাণে সহায়ক হবে।

শেষ কথা

মুঘল আমল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত ঢাকার ইতিহাস এবং ঐতিহ্য বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে। তবে যুগে যুগে পরিবর্তন হলেও ঢাকার মূল চেতনা আজও অটুট রয়েছে। লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিলের মতো ঐতিহাসিক স্থাপনা থেকে শুরু করে পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা পর্যন্ত প্রতিটি প্রতীক ঢাকার ঐতিহ্যের সাথে গভীরভাবে জড়িত। ঢাকার এই দীর্ঘ ঐতিহ্য আমাদের সামনে একটি উদাহরণ স্থাপন করে, কীভাবে একটি শহর তার নিজস্ব সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে ধারণ করে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। ঢাকা আজও একদিকে যেমন তার ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তেমনই আধুনিকতাকেও আপন করে নিয়েছে। ঢাকার এই ঐতিহ্যের অনন্য যাত্রা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস একে অপরের পরিপূরক এবং একসাথে থাকলেই একটি সমাজ সমৃদ্ধ ও সফল হতে পারে।

শিক্ষার্থী, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা কলেজ।

লেপের নিচে মুক্তিযুদ্ধ

সাজিদুল ইসলাম সাজিদ

শীতের রাতে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা। হিমেল বাতাস জানালার ফাঁক দিয়ে ঢুকে দিচ্ছে শীতল বার্তা। বারান্দায় শুকিয়ে রাখা কাপড়গুলো হিম জমে যাচ্ছে, আর ঘরের ভেতর সবাই লেপের তলায় গুটিশুটি মেরে শুয়ে। শিহাব, আট বছরের খুদে দস্যু, দাদির সঙ্গে এক লেপে ঢুকে পড়েছে। শিহাবের চোখে একরাশ কৌতূহল।

'দাদি, মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনাও না,' শিহাবের কণ্ঠে অনুরোধের সুর।

দাদি প্রথমে একটু চুপ থাকলেন। তাঁর চোখে ভেসে উঠল অর্ধশতকের পুরোনো স্মৃতি। শিহাবের আবদার এড়ানোর কোনো উপায় নেই। তিনি লেপ টেনে নাতির গায়ে দিলেন, তারপর শুরু বললেন, 'এই গল্প অনেক পুরোনো, কিন্তু আমাদের জীবনের সবচেয়ে দামি গল্প। শোন তাহলে—

'তখন ১৯৭১ সাল। চারদিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচার। গ্রামের

পর গ্রাম জ্বলছে, মানুষের চিৎকারে বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। সবাই জানত, এভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আমাদের স্বাধীনতা চাই।

তোমার দাদু ছিল গ্রামের একজন শিক্ষক। কিন্তু সে শুধু বইয়ের শিক্ষক ছিল না, মানুষকে অনুপ্রাণিত করত মুক্তির পথে চলতে। সে বলত, "দেশের মাটি, দেশের মানুষ—এদের রক্ষা করতে হলে যুদ্ধ করতে হবে।" একদিন সে তার কয়েকজন বন্ধুদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।'

শিহাব উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদি, দাদু কি তখন ভয় পেতেন না?'

দাদি একটু হাসলেন, কিন্তু তার চোখের কোণে পানি জমতে লাগল। 'তোমার দাদু ভয় পেত না। সে বলত, "ভয় পেলে কেউ বাঁচতে পারে না। আর এই যুদ্ধ তো আমাদের প্রজন্মের বাঁচার লড়াই।"

তোমার দাদু আর তার বন্ধুরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে তোমার দাদু আমার হাতে তার একটা পুঁতির তসবি দিয়ে বলল, "আমি ফিরতে নাও পারি, কিন্তু তুই শক্ত থাকিস। আমাদের বিজয় হবে।" সেই তসবি আজও আমার কাছে আছে।

যুদ্ধের ময়দানে তোমার দাদু ছিল সাহসী এক যোদ্ধা। তাকে সবাই "মাস্টার দা" বলে ডাকত। একদিন খবর এলো, পাকবাহিনী আমাদের গ্রামের পাশে একটি বড়ো শত্রুর দুর্গ গড়ে তুলেছে। সেটা ধ্বংস না করলে আমাদের গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাবে।

তোমার দাদু আর তার দল সেই দুর্গে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করল। চারদিকে অন্ধকার রাত। পাহাড়ি এলাকার শীত তখন খুব তীব্র। দাদু তার লোকদের বলল, "সাবধানে থাকবে। এই অভিযান আমাদের স্বাধীনতার পথে আরেক ধাপ এগিয়ে নেবে।"

তারা রাতের অন্ধকারে পাহাড়ি পথে চলল। দুর্গের খুব কাছে এসে থেমে গেল। দাদু তার হাত উঁচু করে সংকেত দিল। সবাই নিঃশব্দে প্রস্তুত। ঠিক মধ্যরাতে শুরু হলো গুলির শব্দ। চারপাশ যেন যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে গেল। তোমার দাদু সামনের দিক থেকে নেতৃত্ব দিল। তার চোখে ভয় ছিল না, ছিল কেবল দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা।'

শিহাব শিহরিত কণ্ঠে বলল, 'তারপর কী হলো, দাদি?'

দাদি একটু থামলেন। লেপের ভেতর থেকে আঁচল বের করে চোখ মুছলেন। কণ্ঠ ভারী করে বললেন, 'যুদ্ধ চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তোমার দাদু আর তার দল সাহসের সঙ্গে লড়ল। দুর্গ ধ্বংস হলো, কিন্তু...! শেষ মুহূর্তে পাকবাহিনীর এক স্নাইপার গুলি চালাল।

তোমার দাদু তখন নিজের দলের একজনকে বাঁচাতে সামনে এগিয়ে গিয়েছিল। গুলিটা তার বুক ভেদ করল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। তবু শেষবারের মতো বললেন, "তোমরা পিছু হটবে না। বিজয় আমাদের হবেই।"
তোমার দাদুর সেই কথা সত্যি হলো। তার আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। তার দলের সবাই শপথ করেছিল, তারা দেশের স্বাধীনতা না দেখে ফিরবে না। সেই যুদ্ধ শেষে আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীন বাংলাদেশ।'

শিহাব নিস্তব্ধ হয়ে দাদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার কচি মনের ভেতর দাদুর সাহসী চিত্র ঘুরপাক খেতে লাগল। সে একটু ফিসফিস করে বলল, 'দাদি, তোমার মন খারাপ লাগছে?'

দাদি হেসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। 'না রে বাপু, মন খারাপ নয়, গর্ব হচ্ছে। তোর দাদু শহিদ হয়েছেন, দেশের জন্য জীবন দিয়ে গেছেন—এমন স্বামী পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।'

শিহাব দাদির গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'দাদি, আমিও বড়ো হয়ে দাদুর মতো সাহসী হবো।'

দাদি চোখ মুছে বললেন, 'তুই সাহসী হবি, কিন্তু মনে রাখবি, সাহসের সঙ্গে ভালোবাসা থাকলে তবেই বিজয় সম্ভব। তোর দাদু যেমন দেশকে ভালোবেসেছিল, তুইও তেমন করে ভালোবাসবি। এই দেশ আমাদের মা, তার জন্য সব ত্যাগ করার মতো সাহস থাকতে হবে।'

শীতের রাত ধীরে ধীরে গভীর হয়ে আসছিল। কিন্তু শিহাবের মনে তখন যুদ্ধের উত্তেজনা, বিজয়ের আনন্দ আর দাদুর ত্যাগের গল্প অমলিন হয়ে রয়ে গেল।

ঝিনিয়া, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা

মুক্তির ডাকপিয়ন

ইসমত আরা সুপ্তি

ডিসেম্বরের কনকনে শীতের বিকেল, সন্ধ্যা হবুহবু। শীতল রাতের আগমনি বার্তার সাথে ধেয়ে আসছে উত্তুরে হিমেল হাওয়া, প্রকৃতি ঢেকে যাচ্ছে কুয়াশার চাদরে। ক্রমেই বাড়ছে শীতের প্রকোপ। চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে পাখিদের নীড়ে ফেরার কোলাহল। এমন ক্ষণে, অতি সঙ্গোপনে চারিদিকে সর্তক দৃষ্টি ফেলে বাঁশবাগানের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে রবি নামের এক কিশোর। ফিনফিনে পাতলা একটা শার্ট গায়ে আর জোড়াতালি দেওয়া হাফপ্যান্ট পরনে তার। নাঙা দুটো পায়ে সে যখন হাঁটে, প্রতি পদক্ষেপে শব্দ তোলে বাঁশের শুকনো পাতারাশি, তাই বিড়ালের মতো নিঃশব্দে হাঁটার প্রচেষ্টায় ছোট্ট বাঁশবাগানটা পেরুতেই তার অনেকটা সময় কেটে যায়, অথচ গন্তব্যে পৌঁছাবার ভীষণ তাড়া তার, পেটের সাথে গামছা দিয়ে প্যাঁচিয়ে সে এক অমূল্য রত্ন পৌঁছাবার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে বিগত কয়েক মাস ধরে। তারই ধারাবাহিকতায় আজ এসেছে এই গ্রামে। ওই তো মাঠের অদূরেই দেখা যাচ্ছে

এক বিধবার কুঁড়েঘর, কিশোরের আজকের গন্তব্য এখানেই।
ঘরের দোরে গিয়ে সে চুপেচুপে ডাকে—মা, ও মা!
খানিক পরেই দোর খুলে যায়, বিধবা যেন অধীর আগ্রহে বসে ছিলেন এমন একটি ডাকের অপেক্ষায়।
দ্রুততার সাথে ঘরে ঢুকে দোর আটকে দেয় ওরা। বলা তো যায় না, কখন কোন মানুষরুপী শকুনের নজর পড়ে যায়।

তারপর বিধবা আকুল হয়ে বলে, আমার খোকার কোনো খবর এনেছিস বাছা? রবি হাসে, বড়ো মনোহর সেই মায়াবী হাসি, মা তাকিয়ে থাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে। ধীরে ধীরে যেন রবির মুখটা তার খোকার মুখে পরিণত হয়, সেই মায়াবী মুখ থেকে উচ্চারিত হয়, এনেছি তো মা, এই যে, আমার পেটের সাথে পলিথিনে মুড়িয়ে, গামছায় প্যাঁচিয়ে আমার ভাই, মুক্তিসেনার চিঠি নিয়ে এসেছি! মা অতি আগ্রহে চিঠিতে হাত বুলায়, চুমু খায়। তারপর রবি মাকে চিঠি পড়ে শোনায়, মা আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে যেন শুষে নিতে থাকে খোকার পাঠানো রত্নখচিত কথামালা।

মাগো,
কেমন আছ মাগো আমার, কেমন আছ তুমি?
ও মা, খুব দ্রুতই মুক্ত হবে তোমার প্রিয় ভূমি।
নিত্যদিনই মারছি হানা হচ্ছে ওরা ক্ষয়,
খুব দ্রুতই হবে দেখো সোনার বাংলা জয়।
ফিরব তখন তোমার কোলে হয়ে যে বীর গাজি,
কিংবা যদি শহিদ হই মা, তাতেও আছি রাজি।
তোমার প্রিয় দেশের তরে যাই যদি মা মরে,
দেখবে মাগো দেশের মাটি রাখবে আমায় স্মরে।
ভেবো না মা; ভালো আছি, দোয়ায় রাখো জানি,
ভালো থেকো এই দোয়াতে দিচ্ছি ইতি টানি।

কিশোর রবি মুগ্ধ হয়ে পড়ে। চোখমুখে তার খেলা করে এক অপার্থিব সুখ। মায়ের চোখে জল, মুখে অদ্ভুত এক প্রশান্তি। মা রবিকে যত্ন করে খাওয়ায়, অনেক দিন পরে রবি পেটপুরে তৃপ্তি নিয়ে খায়। খেতে খেতে বিগত দিনের গল্প করতে থাকে, এই তো বছরের শুরুতেও সব ছিল তার, বাবা মা ভাইবোন, সুখের সংসার।

তারপর দূর থেকে উড়ে এলো শকুনের ঝাঁক, দেশীয় শকুনের সাথে মিলেমিশে তারা মেতে উঠল ধ্বংসলীলায়। পুড়িয়ে দিলো রবির চেনা আঙিনা, পরিচিত গ্রামখানা। হানাদারের গুলিতে নিজের চোখের সামনে রবি চিরতরে হারিয়ে যেতে দেখল—তার প্রিয় বাবা-মাকে। অতি আদরের ছোট্টো বোনটাও তার হাত ছুটে অজানায় হারিয়ে গেল দিকবিদিকশূন্য হয়ে পালাবার বেলা। সেই থেকে রবি এক আপনজনহীন যাযাবর কিশোর। যার কেউ নেই আবার সবাই আছে!

শতশত মুক্তিযোদ্ধা ভাই তার, শত শত মায়ের কাছে সে দৌড়ে ফেরে মুক্তিযোদ্ধার

চিঠি নিয়ে। না হোক আপন, এমন দিনে পর কে আছে?

খাওয়া শেষে শীতটা যেন একটু বেশিই জেঁকে বসে, তবুও সে উঠে পড়ে। মা অনুরোধ করে এই তীব্র শীতের রাতটা কিশোর যেন মায়ের কাছেই থাকে। কিশোর রবি মৃদু হেসে জানায়, তার কাছে যে আরও দুজন মুক্তিসেনার চিঠি আছে! সেই চিঠিগুলোও যে আজ রাতেই পৌঁছে দিতে হবে নির্দিষ্ট গন্তব্যে।

মা তবুও অনুরোধ করে, কিন্তু সকল অনুরোধ উপেক্ষা করে রবি রওনা দিতে পা বাড়ালে মা তাকে কিছু সময়ের জন্য আটকায়, চৌকির নিচে থেকে পুরাতন টিনের বাক্সটা খুলে বের করে দেয় তার খোকার শীতের জ্যাকেট, রবির গায়ে জ্যাকেটটা বেশ বড়োসড়ো হলেও ভীষণ উম লাগে শরীরে। আনমনে রবি ভাবে, আচ্ছা, স্বাধীন দেশের বাতাস কি এমন উষ্ণ, মায়াময়?

মা এবার খোকার জুতা বাড়িয়ে দিলে সেগুলো রবির অনেক বেশিই বড়ো হয় বলে মা বুদ্ধি করে নিজের জুতাজোড়া পরিয়ে দেয় রবিকে। নিজে না হয় এই কদিন চলবে খোকার জুতা পরে। তারপর একদিন খোকা ফিরবে স্বাধীনতা নিয়ে, দিনের পরে দিন কাটছে এই প্রত্যাশায়।

কিশোর রবি ফের বেরিয়ে পড়ে, নতুন গন্তব্যের অভিমুখে। নতুন কোনো মা, বধূর মুখে হাসি ফোটাবে মুক্তিসেনার চিঠি পৌঁছে দিয়ে। এ কাজে ঝুঁকি আছে বিস্তর, এই তো কদিন আগেও তাকে সন্দেহ করে দেশীয় রাজাকার, যদিও রবির উলটো-পালটা কথায় তাকে পাগল ভেবে প্রাণে মারেনি কিন্তু গলা পানিতে দুই ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রেখেছিল কনকনে শীতের রাতে। রবি তখন অনিমেষ তাকিয়ে ছিল পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদের দিকে; মনে হচ্ছিল, ওই তো স্বাধীনতা, কেমন স্নিগ্ধ, মায়াময়। দু হাত বাড়িয়ে সে চাঁদকে ডাকছিল, আয় আয় আয়! এই দেখে তাকে ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিল দেশীয় শকুনের দল।

রাত বাড়ছে, ঝাঁকিয়ে বসেছে শীতের প্রকোপ। মুক্তিযোদ্ধার জ্যাকেট গায়ে কিশোর হাঁটে, চারিদিকে যেন ভরে থাকে এক মায়াভরা নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায়। দূরের কুঁড়েঘরের আঙিনায় থেকে তার গমন পথের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে একরাশ প্রত্যাশা আর মায়া নিয়ে ছায়ামূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এক মা কিংবা মাতৃভূমি।

গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী।

উষ্ণতা

হাবিবুন নাহার মিমি

উমার তার ছোট্ট পিঠার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। উচ্ছ্বাস আর উত্তেজনায় চোখ দুটো ঝলমল করছিল। ভাপাপিঠা, পাটিসাপটা আর চিতইপিঠার গরম গরম সুগন্ধ কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল। পথচলতি যে কারোর মন কেড়ে নেওয়ার জন্য এই সুগন্ধই যথেষ্ট। উমারের মা তার সাধ্যমতো চেষ্টা করে পিঠাগুলোকে শুধু সুস্বাদুই নয়, দেখতেও দারুণ করে তুলেছিলেন। প্রতিটি পিঠার ওপরে ছিল গুড় আর নারকেলের অন্যরকম সুন্দর সাজ। আর তার বাবা দোকানটিকে সাজিয়েছিলেন রঙিন কাগজ ও বেলুন দিয়ে। দোকানের সামনে একটি ব্যানারে লেখা ছিল, 'রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন না; যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না।' (বুখারি, মুসলিম, মিশকাত)

কিন্তু সময় যেন ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছিল। জুম্মার নামাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও দোকানের সামনে এখনও কেউ আসেনি। আল হারামাইন ইসলামিক স্কুলের সামনের সেই রাস্তা, যা সাধারণত ছাত্র আর

আশেপাশের লোকজনের কোলাহলে মুখরিত থাকে, আজ যেন তা একটু বেশিই শান্ত। উমার একবার তার মা-বাবার দিকে তাকাল। ঠোঁটে হাসি রাখার চেষ্টা করলেও সে তার চোখের হতাশা লুকাতে পারছিল না। বাবা তার কাঁধে হাত রাখলেন, আর মা মমতাভরা চোখে তাকে উৎসাহ দিলেন।

"এটু সবর করো, ছোট্ট মুজাহিদ। কখনো কখনো পুরস্কার পেতে একটু সময় লাগে," বাবা মৃদুস্বরে বললেন।

উমার মাথা নাড়ল, আশা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল। ঠিক তখনই দূর থেকে পায়ের শব্দ আর মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে শুরু করল। জুম্মার পর একজনের জানাজার নামাজ থাকায় মুসল্লিদের একটু দেরি হয়ে গেছে মসজিদ থেকে বের হতে। প্রথম একজন ক্রেতা দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল, চোখে কৌতূহলের ঝিলিক। কিছুক্ষণ পর আরও কয়েকজন আসতে শুরু করল। কেউ উমারকে চিনল তার মায়ের ফেসবুক পোস্ট থেকে, কেউ আবার বাবার মাধ্যমে শুনেছিল।

একজন সাদা পাঞ্জাবি পরা মানুষ এগিয়ে এসে কয়েকটা পিঠা কিনলেন। তিনি উমারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আল্লাহ তোমার উদ্যোগে বারাকাহ দান করুন, ছোটভাই।" এরপর আশেপাশের শিশুরা এসে জড়ো হলো, হাতে মুঠোভরা কয়েন। তাদের চোখে বিস্ময় আর আনন্দমাখা হাসি। উমার একের পর এক পিঠা তুলে দিতে লাগল, তার মুখে তখন আনন্দের ঝলক। উমারের মায়ের বান্ধবীরা ও বাবার বন্ধুরাও উমারের উদ্যোগকে এপ্রিশিয়েট করতে এসেছে আজ।

পিঠাগুলো এত দ্রুত বিক্রি হয়ে গেল যে, দোকানের সামনে মানুষের কোলাহল আর হাসির শব্দে পরিবেশ উষ্ণ হয়ে উঠল। উমারের মা দোকানের পেছনের পর্দাঘেরা জায়গা থেকে খুশিমনে পিঠার ট্রেগুলো ভরতি করতে থাকলেন, আর বাবা ক্রমশ বাড়তে থাকা ভিড় সামলাতে উমারকে সাহায্য করলেন। উমারের কয়েকজন বন্ধুও উমারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো।

দিনের শেষে উমারের হাতে টাকাভরতি বাক্স ছিল, যা তার কল্পনার চেয়েও ভারী। মা-বাবা উমারকে জড়িয়ে ধরলেন, তাদের চোখে ছিল আনন্দের অশ্রু।

উমারের মায়ের মনে পড়ল সেই ভোরের কথা।

অন্ধকার আকাশে ভাসমান কুয়াশার চাদর ঢাকা দিয়ে রেখেছিল শীতের সকালকে। নয় বছর বয়সি উমার জানালার ধারে বসে বাইরে তাকিয়ে ছিল। ঠান্ডা বাতাসে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেমেয়েগুলোকে দেখে তার বুকের ভেতর কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। ছেঁড়া জামা, খালি পা, আর নিশ্বাসে ঠান্ডা ধোঁয়া। উমার জানে, শীত তাদের জন্য কোনো উৎসব নয় বরং লড়াই।

উমার পিঠ ঘুরিয়ে ছোট্ট ঘরটায় পা ফেলে। তার চেহারায় এক অদ্ভুত দৃঢ়তা। মাকে দেখে সে বলে, "মা, আমি কিছু করতে চাই। আমি শীতের এই ঠান্ডায় পথশিশুদের সাহায্য করতে চাই।"

মা হেসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "তুমি তো অনেক ভালো একটা কাজ করতে চাও বাবা, আলহামদুলিল্লাহ। বলো তো কীভাবে করা যায়?"

উমার একটু ভেবে বলল, "মা, এই মৌসুমে তো পিঠা অনেক ভালো বিক্রি হয়। আর তুমিও দারুণ পিঠা বানাও। আমরা যদি একটা পিঠার দোকান দিই, তাহলে মনে হয় আমরা যথেষ্ট টাকা উঠাতে পারব। সেই টাকায় তাদের জন্য কম্বল কিনে দেবো ইনশাআল্লাহ।"

মা আনন্দে মুগ্ধ হয়ে বললেন, "তাহলে তো আমাদের কাজ শুরু করা দরকার! তার আগে তোমার বাবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এসো। আমি পিঠা বানাতে তোমাকে সাহায্য করব ইনশাআল্লাহ।"

উমার বাবার কাছে গেল, তার পরিকল্পনার কথা বলতেই বাবা হেসে বললেন, "তাহলে দোকানটা সাজানোর দায়িত্ব আমার। আমি সব ভালো কাজে তোমার সাথে আছি বাবা।"

মা বাবার অনুপ্রেরণা পেয়ে উমারের আজকের এই পিঠার দোকানের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলো।

উমারের এই উদ্যোগের খবর দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, অন্য শিশুদেরও অনুপ্রাণিত করল সাহায্যের জন্য কিছু করতে। পরদিন স্কুলের অ্যাসেম্বলিতে প্রধান শিক্ষক উমারের প্রচেষ্টার কথা বললেন, আর তাকে এলাকার শিশুদের জন্য এক অনুপ্রেরণা হিসেবে ঘোষণা করলেন।

শীতের সেই সময়ে, উমার আর তার মা-বাবা পথশিশুদের জন্য কম্বল, সোয়েটার আর গরম কাপড় কিনলেন। স্থানীয় লোকজনও তাদের পাশে এসে দাঁড়াল, সাহায্য করল আর তাদের উপহারগুলো বিতরণে অংশ নিল। এক শীতল সকালে, উমার যখন প্রথম কম্বলটি এক কাঁপতে থাকা ছোট্ট ছেলেকে দিলো, ছেলেটির কৃতজ্ঞ চোখের দিকে তাকিয়ে উমার বুঝতে পারল তার চেষ্টা সার্থক হয়েছে।

উমার হাসল, বুকের ভেতর তৃপ্তির উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল। সে বুঝতে পারল, অন্যদের ঠান্ডা থেকে রক্ষা করার যাত্রায় সে শুধু উষ্ণতার খোঁজই পায়নি, বরং খুঁজে পেয়েছে তার জীবনের সার্থকতা। আর উমারের পিঠার দোকানের গল্প হয়ে উঠল এলাকার ঘরে ঘরে আলোচনার বিষয়, যা সবাইকে মনে করিয়ে দিলো—ছোট্ট হৃদয়ও বড়ো পরিবর্তন আনতে পারে।

ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শীতের উপহার

মাসুমা সুলতানা হাসনাহেনা

নাফিসের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। মাঝামাঝি শীতের আমেজে ভরে উঠেছে পুরো গ্রাম। পিঠাপুলির ধুম পড়েছে প্রত্যেক বাড়িতে। নাফিস গ্রামের মাদরাসায় দশম শ্রেণির ছাত্র। গ্রামে বেড়ে ওঠা নাফিসের শহুরে জীবনযাপন সম্পর্কে তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই। গ্রামীণ পরিবেশ তার অনেক প্রিয়। শীতের সকালে কুয়াশা ঢাকা চাদরের মধ্যে গাছি ভাইয়ের রসে ভরা পাত্র নিয়ে মনের আনন্দে বাড়ি ফেরা, সকালের মিষ্টি আলোয় শিশিরভেজা ঘাসের উপর হেঁটে হেঁটে সূর্যের কিরণ গায়ে মাখা—ভীষণ ভালো লাগে তার। নাফিস পরীক্ষা শেষে লম্বা ছুটি পেয়েছে। একদিন নাফিসদের বাড়ি তার এক দুঃসম্পর্কের ফুফু বেড়াতে আসেন।

ফুফু রাজধানী ঢাকার বাসিন্দা। ফুফাতো দুই ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। বাসায় ফুফু প্রায় একা সময় কাটান। এবার ছুটিতে নাফিসকে সাথে করে নিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছেন তিনি। নাফিস গ্রাম ছেড়ে যেতে চায়নি, তবুও মায়ের আদেশে রাজি হলো। সব গুছিয়ে ব্যাগে ভরে নিল। দেখতে দেখতে ঢাকা রওনা হওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো। বিকেলে তারা দু-জন ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে বাসে উঠে পড়ে। গাছগাছালি বাড়িঘর মাড়িয়ে বাস ছুটে চলছে গন্তব্যে। কয়েক ঘণ্টা পর নাফিস পৌঁছে গেল ফুফু বাড়ি।

আধুনিকতার ছোঁয়ায় ঢাকা রাজধানীর প্রতিটি কোণ। গ্রামীণ চিহ্নের কোনো বালাই নেই। ক্লান্ত থাকায় রাতে ঘুমিয়ে পড়ে নাফিস। মুয়াজ্জিনের ডাকে ঘুম ভাঙে তার। নামাজ ও তিলাওয়াত শেষে নাফিস ঘুরতে বের হয় অচেনা রাস্তায়।

সকালের সূর্যের স্নিগ্ধ সুষমায় ইট-পাথুরে ব্যস্ত শহর ঝলমল করছে। চারিদিকে কাকের কর্কশ ধ্বনি বেজে উঠছে একটানা।

পথের পাশে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। নাফিস ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তার চোখে পড়ে লেকের পাশে উঁচু খাম্বার উপর, সেখানে ছোটো ছোটো দুটো বাচ্চা ছেলে ঠান্ডায় জড়সড়ো হয়ে শুয়ে আছে। থরথর করে কাঁপছে তাদের পুরো শরীর। এই দৃশ্য দেখে নাফিসের চোখ ছলছল করে উঠল।

কিছুদূর যেতেই আবার চোখে পড়ে—একদল ছেলেমেয়ে গায়ে পাতলা ময়লা কাপড় জড়ানো, চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। একমনে বোতল কুড়াতে ব্যস্ত তাদের কিশোর মন।

নাফিস এই দৃশ্য দেখে আর সেখানে দাঁড়াতে পারল না। সোজা রওনা দিলো ফুফু বাড়ি। বাসায় ঢুকতেই ফুফু দেখলেন নাফিস অনেক চিন্তিত। জিজ্ঞেস করলেন, বাবা কী হয়েছে তোমার?

নাফিস সব কথা ফুফুকে খুলে বলে, বলতে বলতে তার চোখ বেয়ে পড়ে একফোঁটা নোনাজল।

ফুফু এই বিষয়টা নিয়ে এতদিন ভাবেননি। নাফিসের কথায় আজ তার গভীর উপলব্ধি হলো। অশ্রুতে চোখ ভিজে এলো তার। নাফিস রুমে গিয়ে গ্রাম

থেকে আনা তার কিছু গরম কাপড় গুছিয়ে ব্যাগে ভরে নিল। ফুফুও তার ছেলেদের রাখা কিছু পুরাতন কাপড় ও কয়েকটা কম্বল গুছিয়ে নাফিসের ব্যাগে ভরল। কিছুক্ষণ পর দুজনেই এক মহৎ কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

রিকশা দিয়ে যেতেই নাফিস দেখতে পায় দু-ভাইবোন কিছু বোতল বিক্রি করে খাবার কিনছে। নাফিস রিকশা থেকে নেমে তাদের কাছে এগিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

ছেলেটা উত্তর দিলো, আমাদের বাড়ি নেই ভাইয়া। যেখানে রাত হয় আমরা সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ি। আমাদের বাবা-মা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে— বলতে বলতেই ছেলেটার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

নাফিস ও তার ফুফু তাদের সবাইকে এক জায়গায় জড়ো হতে বলল।

একটু পরেই তারা এক জায়গায় জমায়েত হলো।

নাফিস দেখতে পেল, লেকের পাশের সেই ছোট্ট দু-ভাইকে।

আনন্দে ভরে গেল তার বুক। পাশেই ফুফু দাঁড়িয়ে। নাফিস বলল, তোমাদের জন্য আমরা কিছু উপহার এনেছি। একে একে সবাইকে গরম কাপড় ও কম্বল বিতরণ করল। এই দৃশ্য দেখে ফুফুর চোখ বেয়ে আনমনে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। নাফিসের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, যাও বাবা ওদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো।

একটু পর নাফিস খাবার নিয়ে এলো আর সবার হাতে এক প্যাকেট করে দিয়ে দিলো। তাদের চোখ বেয়ে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

তারা সমস্বরে বলে উঠে, ভাইয়া এই শীতে তোমার পক্ষ থেকে পাওয়া এটা আমাদের শ্রেষ্ঠ উপহার।

সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা

যাদের ত্যাগে এ দেশ পেলাম

উম্মুল বারাকাহ আমাতুল্লাহ শারমিন

১৯৭১ সাল। হেমন্তের শেষ। বিবর্ণ কানন বীথির পাতায় পাতায় নিঃশেষে ঝরে যাওয়ার নির্মম ডাক যেন জানান দিচ্ছিল জরাগ্রস্ত শীতের ধূসর বার্ধক্যের আগমনি বার্তা। প্রতিদিনের অভ্যাসমতো গ্রামের মেঠোপথ দিয়ে হাঁটছিল ফারহান। পাতাঝরা শিশিরের টুপটাপ শব্দ এবং পাখির কূজন ছাড়া সমস্ত প্রকৃতিতে তখন এক আশ্চর্য নীরবতা। সময় যাচ্ছিল কুয়াশার ঘনত্ব বেড়েই চলছিল। পঞ্চাশ হাত দূরের বস্তুও দেখা যাচ্ছিল না এমন অবস্থা।

রাস্তায় মানুষের আনাগোনা ছিল না বললেই চলে। আর থাকবেই বা কী করে! পাক বাহিনীর নির্মমতার কারণে সবাই গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছিল। শত্রুর ভয়ে পালাতে গিয়ে শত্রুর সামনে পড়ে যাচ্ছিল। ফারহান এগিয়ে চলছিল আপনমনে। হঠাৎ সে রাস্তার ওপরে একটি গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখতে পেল। সদরের দিক হতে স্কুল ঘরের দিকে ছুটে আসছিল গাড়িটি। সঙ্গে সঙ্গে সে রাস্তার ঢালুতে একটি বাংকারে নেমে চুপ হয়ে বসে থাকল। বিপরীত দিক থেকে অপর একটি গাড়ি এসে থামল বাংকারের কাছাকাছি। সদর হতে আসা গাড়িটিও এখানে এসে থামল। চোখ বাঁধা দুই ব্যক্তিকে গাড়ি থেকে নামানো হলো।

পরনে পাঞ্জাবি, মাথায় পাগড়ি, বাবরি চুল দেখে আঁতকে উঠল ফারহান।

এদের একজন ফাহিম ভাই নয়তো! ফাহিম তো শুরু থেকেই পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ছে। সে সন্দেহ দূর করার জন্য রাস্তায় উঁকি দিলো। খান সেনারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। হঠাৎ এক খান সেনা সার্চ লাইট ঘুরালো।

ফাহিম!
সর্বাঙ্গে কাটা দিয়ে উঠল ফারহানের। স্কুল ঘরের দিক থেকে আসা গাড়িটিতে ফাহিম ও সিফাতকে তুলে দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে সদরের দিকে চলল প্রথম গাড়িটি। দ্বিতীয় গাড়িটিও স্কুল ঘরের পথ ধরল। গাড়ি দুটি চলে যাওয়ার পর ফারহান বাড়ির পথ ধরল। চোখে-মুখে তার দাবানলের ছাপ স্পষ্ট। বুক ভরা সাহস নিয়ে সে এলাকার কমান্ডার মাহফুজের কাছে গেল। কমান্ডার সাহেবকে অনুরোধ করল তাকে যুদ্ধে নেওয়ার জন্য। কমান্ডার সাহেব তাকে যুদ্ধে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ওদিকে খান সেনাদের গাড়ি থামল স্কুল ঘরের ডান দিকে পাক বাহিনীর ক্যাম্পে। ফাহিম ও সিফাতকে নিয়ে গেল এক অন্ধকার রুমে। সেখানে আগ্রাসী পদক্ষেপে বুটের শব্দ তুলে প্রবেশ করল আরও পাঁচজন খান সেনা। এক খান সেনা বিকট শব্দে চ্যাচিয়ে উঠল। ওদের দুজনকে হাত-পা বেঁধে উলটো করে ঝুলিয়ে পেটাতে লাগল। পায়ের তলা ও নিতম্বে আঘাতের পর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। অতঃপর দুজনকেই টেনে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলো। বন্দুকের নল উঁচিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করল—
'মুক্তি কিধার হ্যায় বোলো।'

দুজনের এক উত্তর তারা জানে না। খান সেনাদের কমান্ডার নির্দেশ দিলেন দুজনকেই বিবস্ত্র করে নখ উপড়ে ফেলতে। ক্ষতস্থানে লবণ, মরিচের গুঁড়া লাগিয়ে দিতে। তা-ই করা হলো।

মধ্যরাত। হাড় কাঁপানো শীতে কর্দমাক্ত স্যাঁতসেঁতে কক্ষে হাত পা বেঁধে ওপরে মই চাপা দিয়ে রাখল। একটু পর আরেক খান সেনা প্রবেশ করল বরফ নিয়ে। দুজনের উপর নিচে বরফ রেখে দুই খান সেনাকে পাহারায় রেখে বাকিরা চলে গেল।

—ফাহিম, আর সহ্য করা যাচ্ছে না। এ যে জাহান্নামের শাস্তি!
—সিফাত, আল্লাহকে স্মরণ করো। মৃত্যু সন্নিকটে। স্বদেশকে ভালোবাসা কোনো পাপ নয় । জালিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরাও পাপ নয়। আল্লাহ আমাদের শহিদি মৃত্যু দান করুন।
খান সেনা দুজন হো হো করে হেসে উঠল।

রাতটা এভাবেই কাটল। সকাল হতেই আবারও দুজনকে উলটো করে ঝুলিয়ে রাখল।

বেলা এগারোটা।
ফারহান লুকিয়ে লুকিয়ে পাক বাহিনীর ক্যাম্পের পেছনে এলো। দুজন খান সেনা বাঁয়ের একটা রুমের দিকে ইঙ্গিত করে কিছু বলছিল। ফারহান বুঝল হয়তো বাঁয়ের রুমে কিছু একটা আছে। তাই সে চুপিচুপি রুমটার পেছনে এসে বসল। বোমা হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিল সে। ভয়ডর নেই। জীবন মৃত্যু সব আল্লাহর হাতে। একটা গাড়ি এসে থামল ক্যাম্পের সামনে। গাড়ি থেকে নামানো হলো চোখ বাঁধা এক মহিলাকে।

কেঁপে উঠল ফারহান। এ মহিলা সিফাত ভাইয়ের মা নয়তো! সে ভালোভাবে দেখার জন্য মাথা তুলল।
হঠাৎ এক খান সেনার দৃষ্টি গেল জঙ্গলের দিকে।
'মুক্তি! মুক্তি!'
চিৎকার করে উঠল সে।

সবাই একসঙ্গে গুলি ছুড়ল। কিন্তু গুলি ফারহানকে স্পর্শ করল না। খান সেনাদের কেউই জঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করল না। অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল।

অতঃপর একজন বলল, মুক্তি নেহি কমান্ডার সাব!
তারা সবাই চলে গেল সেখান থেকে। ফারহান মাথা তুলে দেখতে লাগল এরপর কী হয়।

সিফাতের মা সালমা বেগমকে নিয়ে যাওয়া হলো সেই কর্দমাক্ত স্যাঁতসেঁতে কক্ষে। ছেলের এ অবস্থা দেখে আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। এক খান সেনা গলা খাঁকারি দিয়ে বলল—বুড়ি, তোমার ছেলে মুক্তি ফৌজের অবস্থান বলে না দিলে সোজা ওপরে পাঠিয়ে দেবো। এখনও সময় আছে তোমার ছেলেকে বুঝাও। আরেক খান সেনা বলল—তোমার ছেলেটা ভীষণ বোকা। অপরের জন্য শুধু শুধু নিজেকে বিপদে ফেলছে। আচ্ছা তুমি দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করেছিলে তাকে। কত কষ্ট করে নিজে না খেয়ে তাকে খাওয়াইয়ে বড়ো করেছ। এখন সে জোয়ান হয়েছে। তাকে তোমার সামনে মেরে ফেললে কেমন লাগবে বলো তো? তোমার কি কষ্ট হবে না?

আরেকজন বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ বুড়ি! যখন সে হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটতে শিখল। আধো আধো বুলিতে তোমায় মা বলে ডাকতে শিখল। সে সময়ের কথা তোমার মনে পড়ে না বুঝি? তোমার সামনে তোমার জোয়ান ছেলে উলঙ্গ হয়ে পড়ে আছে। এতেও কি লজ্জা হয় না বুড়ি? এখনও সময় আছে ছেলেকে বুঝাও।

সালমা বেগম কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন—বাবা সিফাত, আমার সিফাত!
সিফাত মাথা নেড়ে বলল—নাহ আম্মা! নাহ! আমি কখনোই ওদের কথায় রাজি হবো না আম্মা। আমার মৃত্যুকালে আপনি আমায় এমন আদেশ করবেন না, যা পালন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনি আমার

জন্য দোয়া করুন। আমার অন্তিম সময় খুব নিকটে।

খান সেনাদের কমান্ডার গর্জে উঠলেন—শেষবারের মতো প্রশ্ন করো। যদি না বলে তো তিনোটাকেই খতম করে দাও।

বন্দুকের নল উঁচিয়ে আবারও জিজ্ঞেস করা হলো—মুক্তি কিধার হ্যায় বোলো।

তারা নির্বিকার। যেন কিছুই শুনতে পায়নি। পরপর কয়েকটা গুলির শব্দ হলো। ভারী দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ার শব্দ।
অতঃপর একটা আওয়াজ—'আল্লাহু আকবার, আমি এমন মৃত্যুই কামনা করেছিলাম। আল্লাহ আমাদের শহিদ হিসেবে কবুল করুন।'

মাটিতে আছড়ে পড়ল ফারহান।
না! না!
আর অপেক্ষা করার সময় নেই। পাঁচ মিনিট বাকি, বোমা হামলা করতে হবে। সে সুযোগ বুঝে গোলা-বারুদের গোডাউনে আত্মঘাতী হামলা করল। হামলা সফল হলো। ২৫ খান সেনা নিহত। কিন্তু ফারহানকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। পরদিন গ্রাম বাসীরা পাক বাহিনীর পালিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে ক্যাম্পে এলো। ধ্বংসস্তূপের মাঝে পাওয়া গেল বাঙালির চারটি লাশ। বুঝতে বাকি রইল না এ যে ফারহান, ফাহিম, সিফাত ও তার মায়ের লাশ।

সাবাস বাংলাদেশ, সালাম জানাই তোমার সেই বীর যোদ্ধাদের; যাদের ত্যাগে এ দেশ পেলাম।

শিক্ষার্থী, নগরাজপুর ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

আসছে শীত, কাঁপছে হৃদয়

আইয়ুব বিন হাসান

আসছে শীত, কাঁপছে হৃদয়। শরীরটা উষ্ণতা উপভোগ করলেও হৃদয়টা কাঁপছে শীতের ভয়াবহ তীব্রতায়। মানবতা, বিবেক, অনুভূতি নেই যাদের, তারা কীভাবে অনুধাবন করবে কুয়াশাচ্ছন্ন প্রচণ্ড শীতের তীব্রতায় হৃদয়ের সেই ভয়াবহ কম্পন। অন্যের দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি বোঝার জন্য প্রতিটি মানুষের মাঝে থাকা চাই তিনটি গুণ—মানবতা, বিবেক, অনুভূতি। যাদের মাঝে মানবতা, বিবেক এবং অনুভূতি আছে, কেবল তারাই অনুধাবন করতে পারবে রাস্তার পাশে, রেলস্টেশনে কিংবা শহরের অলিতে-গলিতে অবস্থানরত মস্তিষ্কের ভারসাম্যহীন অধিকার ও সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের দুঃখ-কষ্ট।

এই শীতের সময়টা কেমনে কাটবে? কীভাবে কাটবে? এই হতভাগা এবং দুর্দশাগ্রস্ত মানুষগুলোর। পৌষ, মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতের ভয়াবহ তীব্রতায় আমি আপনি এবং আমরা যখন উন্নত পরিবেশে উন্নতমানের দেশি-বিদেশি লেপ, কম্বল ইত্যাদি গায়ে মুড়িয়ে বিভোর ঘুমে মগ্ন থাকি, ঠিক সেসময় আমাদের আশেপাশে একদল অধিকার ও সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিরা করুণ কষ্টে রাত্রি যাপন করে।

তাই আসুন, মানবতা, বিবেক ও অনুভূতি দিয়ে হৃদয়ের মণিকোঠায় অধিকার ও সুবিধাবঞ্চিতদের দুঃখ কষ্টগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করি। তাদের দিকে প্রসারিত করে দিই সাহায্যের হাত। আমাদের মানবিকতার বদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করি, ঘুমন্ত বিবেক জাগ্রত করি, অনুভূতিহীন হৃদয় অনুধাবন যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলি, তবেই অনুধাবন করতে সক্ষম হবো—ভয়াবহ শীতের তীব্রতায় উষ্ণ শরীরে হৃদয়ের সেই ভয়াবহ কম্পন। আসুন আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। এই শীতে সাধ্যমতো অধিকার ও সুবিধাবঞ্চিতদের পাশে দাঁড়াই। উষ্ণতায় ভরে দিই ওদের হৃদয়-প্রাণ। ওরা হাসুক উষ্ণতার হাসি। চলুন আমরা ভালোবাসার চাষাবাদ করি। মানবতার সেবা করি উদারতার প্রাঙ্গণে।

শিক্ষার্থী: দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী।

মৃত্যুদণ্ড

হৃদয় পান্ডে

মৃত্যুদণ্ড বর্তমান বিশ্বে অন্যতম বিতর্কিত শাস্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সারা বিশ্বে মানবাধিকার কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরেই এই শাস্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে চলেছেন। মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতো সংস্থাগুলো মৃত্যুদণ্ডকে নিষ্ঠুর, অমানবিক এবং মানবাধিকার-বিরোধী শাস্তি হিসেবে বর্ণনা করে এর বিলোপের দাবিতে আন্দোলন করে চলেছে। মৃত্যুদণ্ড সভ্য সমাজের নীতি এবং মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। পুরো বিশ্বে বিরোধিতা সত্ত্বেও এখনও অনেক দেশেই মৃত্যুদণ্ডকে তাদের আইনি কাঠামোর একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে ধরে রেখেছে এবং কার্যকর করে চলেছে। বাংলাদেশও সেই দেশগুলোর মধ্যে একটি, যেখানে গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়ে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে, বিশ্বজুড়ে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর হয়েছে এবং অনেক দেশই মৃত্যুদণ্ডকে ধীরে ধীরে তাদের আইনি কাঠামো থেকে বাদ দিয়েছে। বর্তমানে ১৪০টিরও বেশি দেশ মৃত্যুদণ্ডের বিলোপ ঘটিয়েছে, যার মধ্যে অধিকাংশ দেশ স্থায়ীভাবে মৃত্যুদণ্ডকে নিষিদ্ধ করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত প্রায় সব দেশেই এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর এবং তারা মানবাধিকার সুরক্ষার কারণে মৃত্যুদণ্ডকে মানবাধিকারের পরিপন্থী হিসেবে বিবেচনা করে। মৃত্যুদণ্ড এটি একটি স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় শাস্তি, যা কোনো বিচারিক ত্রুটি বা ভুল থাকলে সংশোধনের সুযোগ দেয় না। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে ভুল বিচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়, তবে তার জীবন পুনরুদ্ধার করার কোনো উপায় থাকে না।

দ্বিতীয়ত, গবেষণায় দেখা গেছে যে, মৃত্যুদণ্ড অপরাধ দমনে বিশেষ কার্যকর নয়; বরং অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর আইনি কাঠামো, পুনর্বাসন এবং অপরাধীর সংশোধনের সুযোগ অপরাধ কমাতে অধিক কার্যকর হতে পারে। মৃত্যুদণ্ড একজন ব্যক্তিকে শুধু শাস্তি দেয়, কিন্তু তাকে সমাজে পুনঃপ্রবেশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে, যা দীর্ঘমেয়াদে সমাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশের আইনে এখনও মৃত্যুদণ্ড বহাল রয়েছে এবং এটি বিভিন্ন গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ে থাকে। বিশেষ করে হত্যা, ধর্ষণ এবং সন্ত্রাসবাদের মতো অপরাধের ক্ষেত্রে এই শাস্তি বহাল রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ এই শাস্তিকে অপরাধ দমনে কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে দেখে এবং সমাজের একটি অংশ মনে করে, কঠোর শাস্তি অপরাধ কমাতে সহায়ক হতে পারে। ধর্ষণ বা সন্ত্রাসবাদীর মতো অপরাধের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের দাবি জনগণের মধ্যে প্রবল, কারণ অনেকে মনে করেন যে এই শাস্তি অপরাধীদের জন্য একটি কার্যকর ভীতিপ্রদ মাধ্যম।

তবে গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, মৃত্যুদণ্ড অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি শক্তিশালী ও কার্যকর বিচারিক কাঠামো, অপরাধের জন্য নিশ্চিত শাস্তি এবং অপরাধীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া অপরাধ দমনে বেশি কার্যকর হতে পারে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, কঠোর শাস্তি নয় বরং আইনের কার্যকর প্রয়োগই অপরাধ কমাতে কার্যকর।

বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় মতামত বিদ্যমান। ধর্মীয়ভাবে কিছু অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। এর ফলে, ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যাপক সমর্থন তৈরির প্রচেষ্টা প্রতিনিয়তই কঠিন হয়ে উঠছে। অনেকেই মনে করেন, দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করা হলে অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। তবে সমাজের একটি অংশ, বিশেষত শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠী, মৃত্যুদণ্ডের প্রতি ক্রমবর্ধমান সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছে। তারা অপরাধীদের সংশোধনমূলক প্রক্রিয়া এবং পুনর্বাসনের ওপর জোর দিচ্ছে এবং মনে করছে যে মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে অন্য বিকল্প শাস্তি সমাজে আরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থায় কিছু কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে, যার কারণে নিরপরাধ ব্যক্তিরা মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির মুখোমুখি হতে পারে। বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রভাবশালী মহলের প্রভাব, দুর্নীতি এবং পর্যাপ্ত আইনি সহায়তার অভাবের কারণে বিচার প্রক্রিয়ায় ত্রুটি ঘটে। অনেক সময় নিরপরাধ ব্যক্তিরাও ক্ষমতাবানদের চাপের ফলে শাস্তির শিকার হন। এ কারণে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে, বিচারব্যবস্থার এই দুর্বলতা সংশোধন না করা পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা একটি ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ। নিরপরাধ ব্যক্তি যেন শাস্তির শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করতে হলে বিচার প্রক্রিয়ার সংস্কার প্রয়োজন।

বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ড বিলোপের ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। সমাজের একটি বড় অংশ এখনও মনে করে যে, মৃত্যুদণ্ড অপরাধ দমনের জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা, এবং অপরাধীদের জন্য

কঠোর শাস্তি অপরিহার্য। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনেও মৃত্যুদণ্ড বিলোপের বিষয়ে তেমন কোনো আলোচনা দেখা যায় না। অপরাধের প্রকৃতি, বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং জনমতের কারণে বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ড বিলোপের প্রশ্ন তুললে তা কঠোর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে পারে। তবে সময়ের সাথে সাথে মানবাধিকারের প্রতি সামাজিক সচেতনতার কারণে মৃত্যুদণ্ড বিলোপের জন্য বাংলাদেশকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হতে হবে।

বাংলাদেশ যদি মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করতে চায়, তাহলে অবশ্যই বিকল্প শাস্তিব্যবস্থা নিয়ে ভাবতে হবে। একটি উন্নত সমাজে অপরাধীদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে সামাজিক মূলধারায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড, বাধ্যতামূলক সামাজিক সেবা এবং অপরাধ সংশোধন কর্মসূচির মাধ্যমে অপরাধীদের পুনর্বাসন করা যায়। অপরাধীদের পুনর্বাসন করা মানে, তাদের জীবনকে একটি নতুন সুযোগ দেওয়া, যা তাদের অপরাধমুক্ত জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে সংশোধনের সুযোগ দিলে সমাজে পুনঃপ্রবেশের মাধ্যমে একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে সমাজের জন্যই উপকার বয়ে আনে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মৃত্যুদণ্ড বিলোপের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং বিচার প্রক্রিয়ার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। এর পাশাপাশি পুনর্বাসন ও সংশোধনমূলক শাস্তিব্যবস্থা চালু করা হলে অপরাধ দমনের পাশাপাশি মানবাধিকার রক্ষাও নিশ্চিত করা যাবে।

বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ড বিলোপের বিষয়টি একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং বিতর্কিত ইস্যু। এটি দেশের বিচারব্যবস্থার কাঠামো এবং সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু বিচার প্রক্রিয়ার ত্রুটি এবং পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করলে মৃত্যুদণ্ড বিলোপের দিকেও পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। মৃত্যুদণ্ডের বিলোপের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি মানবিক ও অধিকারনির্ভর সমাজের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, যেখানে অপরাধ দমনের পাশাপাশি মানবাধিকারও সমানভাবে মূল্যায়ন করা হয়।

শিক্ষার্থী; মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা কলেজ।

শিশুশ্রম এক অভিশাপের নাম

সাধন সরকার

শিশুশ্রম জাতির জন্য অভিশাপ। শিশুদের সাথে কখনো শ্রম শব্দটি যুক্ত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু দারিদ্র্য নামক ব্যাধি শিশুদেরকে শ্রমে নিযুক্ত হতে বাধ্য করে। প্রত্যেক বয়সি মানুষের কিছু প্রধান ও অপ্রধান কাজ থাকে। শিশুবয়সে শিশুদের প্রধান কাজ হলো লেখাপড়া করা। যে বয়সে শিশুদের বই-খাতা নিয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা, সে বয়সে শিশু যদি ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সাথে যুক্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে পরিকল্পনায় কোথাও কোনো গলদ আছে। একটি দেশ কতটা উন্নত, শিশুশ্রমিকের সংখ্যা দেখে সেটাও পরিমাপ করা যেতে পারে। পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা শিশুকে শিশুশ্রমে নিযুক্ত হতে বাধ্য করে।

শিশুশ্রম শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) 'জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ-২০২২' -এর তথ্য বলছে, দেশে বর্তমানে শ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ৩৫ লাখের বেশি। এর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের সাথে যুক্ত শিশুর সংখ্যা প্রায় ১১ লাখ। বেসরকারি সংস্থা 'কারিতাস বাংলাদেশ'-এর তথ্য বলছে, বাংলাদেশে পথশিশুর সংখ্যা ১১ লাখের বেশি। এই পথশিশুদের অর্ধেকের বেশির অবস্থান রাজধানী ঢাকা, বিভাগীয় সিটি করপোরেশন এলাকা ও এর আশপাশে। কোনো পরিবার বা অভিভাবক তার শিশুসন্তানকে শ্রমিক হিসেবে দেখতে চায় না। শিশুরা লেখাপড়া বাদ দিয়ে শ্রমিক হিসেবে কেন যুক্ত হয়, এর কারণ চিহ্নিত করা দরকার সবার আগে। মূলত পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, দারিদ্র্য, বৈষম্য, অসচেতনতা ও পারিবারিক সংকট শিশুশ্রমের জন্য দায়ী।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সূত্র বলছে, পাঁচ থেকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত ব্যক্তিকে শিশু ধরা হয়। এর মধ্যে পাঁচ থেকে ১১ বছরের শিশুরা সপ্তাহে এক ঘণ্টা, ১১ থেকে ১৩ বছর বয়সি শিশু সপ্তাহে ২৫ ঘণ্টা এবং ১৪ থেকে ১৭ বয়সি শিশুরা সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজ করলে, তাকে শিশুশ্রম হিসেবে গণ্য করা হয়। 'বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬' অনুসারে, ১৮ বছরের কম কোনো শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা যাবে না। কিন্তু বাস্তবতা সেকথা বলছে না। মনে হচ্ছে, আইন রয়েছে আইনের জায়গায় আর শিশুশ্রম রয়েছে শিশুশ্রমের জায়গায়। পরিসংখ্যান বলছে, গত ১০

বছরে বাংলাদেশে প্রায় ১ লাখের বেশি শিশুশ্রমিক বেড়েছে। শিশুশ্রমের সুনির্দিষ্ট কিছু খাত রয়েছে। যেমন বিভিন্ন ছোট ও মাঝারি কারখানা, কৃষিখাতে, মোটর গ্যারেজ, লেদ মেশিন, ভাঙানি শিল্পখাতে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বেশি।

অনেক কারখানার মালিকরা শ্রমিক হিসেবে শিশুদেরকে পেতে চায়, কেননা শিশুশ্রমিকের বেতন তুলনামূলক কম! যেসব নিম্ন পর্যায়ের পরিবার থেকে শিশুশ্রমিক হিসেবে আসে, সেসব পরিবারে অসচেতনার পাশাপাশি পারিবারিক সংকট কিংবা ন্যূনতম মৌলিক অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। শিশুবয়সে শ্রমিক হিসেবে শিশুদের কাজ করার কথা না। শিশুশ্রমিক বৃদ্ধির পেছনে কোনো একক মন্ত্রণালয়, একক সংস্থা কিংবা একক প্রতিষ্ঠান দায়ী নয়। একটি দরিদ্র পরিবারের জন্য সরকার থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। একটি হতদরিদ্র স্কুলগামী শিশুর জন্য সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এছাড়া পারিবারিক সংকট তৈরি হওয়া পরিবারের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারকদেরও করণীয় রয়েছে। সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সরকারের নানাবিধ কর্মসূচি রয়েছে। তাহলে কেন শিশুশ্রম বাড়ছে? দেশের প্রতিটি সেক্টর যদি যার যার কাজ সঠিকভাবে পালন করত, তাহলে শিশুশ্রমিক তৈরি হওয়ার কথা না।

আন্তর্জার্তিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে বর্তমানে শিশুশ্রমের সাথে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা প্রায় ১৮ কোটি। বেসরকারি তথ্য বলছে, বাংলাদেশে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ৫-১৪ বছর বয়সী মোট শিশু জনসংখ্যার ১৯ ভাগ। বাংলাদেশে বর্তমানে শিশুশ্রমের সাথে যুক্ত সঠিক পরিসংখ্যান নেই বললেই চলে! জাতিসংঘ ২০২১ সালকে 'আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম নিরসন বছর' হিসেবে ঘোষণা করে। বাংলাদেশও শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে কাজ করলেও শিশুশ্রমের অভিশাপ থেকে কিছুতেই মুক্তি মিলছে না। শিশুশ্রম বন্ধে সরকার ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম নির্ধারণ করে ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন কল্পে অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু করোনা মহামারি হঠাৎ করে সবকিছু ওলটপালট করে দেয়। বর্তমানে ৪৩টি ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম নির্ধারণ করে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশকে সব ধরনের শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার লক্ষ্য রয়েছে।

যদি এখনই শিশুশ্রম বন্ধে কার্যকর, পরিকল্পিত ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ না নেওয়া যায়, তাহলে শিশু-শ্রমমুক্ত দেশ গড়া স্বপ্নই থেকে যাবে। 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫' অনুসারে ১৪ বছরের নিচে কোনো শিশুকে গৃহকর্মে নিযুক্ত করা যাবে না। কিন্তু এ নিয়ম দারিদ্র্যের কাছে টিকছে কই? শিশুশ্রমের সাথে যুক্ত প্রায় ৯৪ ভাগই অনানুষ্ঠানিক খাতে। দরিদ্র শিশুরা বাসাবাড়ি, রেস্তোরাঁ, কারখানা, কৃষিকাজ, ভিক্ষাবৃত্তি, পরিবহণ-শ্রমিক হিসেবে এবং বিভিন্ন সেবামূলক শ্রমের সাথে যুক্ত। কারখানা আইনেও শিশুশ্রম নিষিদ্ধের কথা

বলা হয়েছে। আইনে বলা হয়েছে কেউ যদি শিশুশ্রমিক নিয়োগ করে, তাহলে অর্থদণ্ডের বিধানও রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক দুরাবস্থাও শিশুশ্রমের অন্যতম কারণ। তবে বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার কারণে শিশুশ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, মোট শিশুশ্রমের অর্ধেকের জন্য দায়ী জলবায়ুগত দুর্যোগ। উপকূলসংলগ্ন এলাকায় শিশুশ্রম বাড়ছে। দুর্যোগের কবলে পড়ে দিশেহারা মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙন, বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় শিশুশ্রমকে ত্বরান্বিত করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। বোধ করি এ অবস্থা চলতে থাকলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। এটা এমনই এক সামাজিক সমস্যা, যেটা আইন করে পুরোপুরি সমাধান করা সম্ভব নয়। দেশে শিশুশ্রমিক ও পথশিশুদের সঠিক তথ্য-উপাত্ত জানা বেশি জরুরি। কেননা সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকলে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া সহজ হয়।

শিশুশ্রমভুক্ত পরিবারগুলোকে অবশ্যই সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনতে হবে। শিশুশ্রম দেশের উন্নয়নের পথে অন্তরায়। সামাজিক এই সমস্যা এখনই রোধ করা সম্ভব না হলে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট্য (এসডিজি) অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়বে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের পাশাপাশি সমস্যা মোকাবিলায় সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। শিশুশ্রম বন্ধে দরিদ্র পরিবারের অভিভাবকদের সচেতনতা দরকার। সর্বোপরি সামাজিক কর্মসূচির আওতায় জলবায়ু উদ্বাস্তুদের সহায়তায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

জলবায়ু ও পরিবেশকর্মী
সদস্য, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

শীত সুখময় ঋতু

সাইফুল ইসলাম

পৌষের ভোরবেলা ভেঙে গেল ঘুম,
ঊষার দুয়ারে এক তুষারের ঢেউ।
ঝিমঝিমে হিম হাওয়া বয় বার-বার,
দিকে দিকে বাজে যেন শীতের সেতার।
—সুনির্মল বসু

আমাদের বাংলাদেশ ষড়ঋতুর রঙে রঙিন। বর্ণিল প্রাকৃতিক পরিবেশে পরিবেষ্টিত এই দেশ। ঋতু বৈচিত্র্যের অনুপম সৌন্দর্যে তাঁর রূপ ও রকমারি রূপমালায় রূপায়িত হয়। ষড়ঋতুর এই খেলায় এবং মৌসুমের এই পালাক্রমে হেমন্তের প্রৌঢ়ত্বের পরেই চলে আসে জরাগ্রস্ত শীতের ধূসর বার্ধক্য। তখন প্রাকৃতিক পরিবেশের ঘটে অনেক পরিবর্তন, অনেক ভিন্নতা। বিস্তীর্ণ ফসলভূমি হয়ে ওঠে সঞ্জীবনী ও প্রাণচাঞ্চল্যের নিদর্শন। শিশিরফোঁটায় আর্দ্র। গ্রীষ্মকালের শুষ্ক, জীবনহীন ঘাসে আসে স্নিগ্ধতা ও মুগ্ধতা। শীতলতা মানুষের কর্মোদ্যম ও প্রাণচাঞ্চল্য বৃদ্ধি করে। শীতকালের পরিবেশ হয় প্রতিহতযোগ্য ও সুকর্মক্ষেত্র। এবং শীতলতা মানুষের মাঝে সৃজনশীলতার উপাদান সৃষ্টি ছাড়াও বৈরী প্রভাব সৃষ্টি করে। অবশ্য সবমিলিয়ে তা সুখময় ও সুখকর।

শীতের বিভিন্ন দিক:

ষড়ঋতুর পঞ্চম হলো শীত ঋতু। এটা গ্রীষ্মের ঠিক বিপরীত। পৌষ ও মাঘ এই দুই বাংলা মাসের সমষ্টিই হলো এই মৌসুম। ইংরেজি মাসের ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতকালের সময় হলেও আসলে নভেম্বর হতেই শীত শীত ভাব আসে। শীতকালে দিন ছোট আর রাত দীর্ঘ হয়।

শীতে সকাল-সন্ধ্যা:

শীতের সকালে ঘুম ভাঙে লেপ-কম্বল ইত্যাদির ভেতর থেকে আলস্য ভাব নিয়ে। তবে গরমকালের মতো দ্রুততার সঙ্গে বিছানা ত্যাগ সম্ভবপর হয় না বরং দীর্ঘসূত্রিতা প্রায় সকলের মধ্যেই লক্ষ করা যায়। তারপর গ্রামে মা-বোনদের হরেক রকমের পিঠার ডালা দিয়ে নাস্তার বিপুল সমাহার। সর্বোপরি খেজুরের রস তো অবশ্যই আছে। গ্রামে সজীব কৃষ্ণমালার স্নিগ্ধতা, ঘাসের আর্দ্রতা, টিনের চালের শুষ্কহীনতা, প্রাকৃতিক নিকট পরিবেশের অনুপম সৌন্দর্যমালা ও হৃদয়ের প্রফুল্লতা

এসবই অন্যতম উপভোগ্য বিষয়। ধীরে ধীরে সূর্য তার অন্তরাল হতে প্রকাশ্যে আসে। তবে তার তীব্রতা আগের মতো আর প্রখর অনুভূত হয় না। থরথরে কম্পমান ভাবটাও তখন প্রায় প্রস্থানের অপেক্ষায়। তারপর আসে দুপুর, তারপর সন্ধ্যা। সে কি এক সুখকর সন্ধ্যা! অপূর্ব সাজে সজ্জিত এক সান্ধ্যসময়। শীতকালের শীতলতায় তার সজ্জা হয়ে ওঠে আরও সুন্দর ও কোমল। মাগরিবের সময়ের পরে খেলায় জমে ওঠে বিভিন্ন মাঠ। অবশ্য লাইটের আলোতে রেকেট খেলায় গ্রামের ছোঁয়া পাওয়া শহরগুলোতে এই দৃশ্য গ্রামের চেয়ে বেশি দেখা যায়।

শীতে ফুল ও ফলঃ

এ শীতকালের যেসব দৃশ্য উপভোগ্য হয়, সেগুলোর মধ্যে ডালিয়া অন্যতম। শীতকালের নিজস্ব ফুল হলো কৃষ্ণকলি। এছাড়া শীত মৌসুমের নজরকাড়া ফুল হলো—গাঁদা, ডেইজি, সূর্যমুখী, চন্দ্রমল্লিকা ও সুইটপি।

এ ছাড়া প্রকৃতিপ্রেমীদের চোখজুড়াতে সরিষা ফুলের জুড়ি নেই। অবশ্য এ ঋতুর রয়েছে রকমারি সবজিও। যেমনঃ ফুলকপি ও বাঁধাকপি ইত্যাদি।

শীতে দুস্থদের অবস্থাঃ

শহর-গ্রামের উভয় জায়গার গরিবদের একই অবস্থা। গ্রামের দুঃস্থদের তো মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু আছে। তবে শহরের ছিন্নমূল লোকদের তো ঠাঁইটুকুও নেই। অসহায়দের তো কম্পমান শীতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার অবস্থা। কোনোরকম পাতলা, তাও আবার জীর্ণ-শীর্ণ কাপড়টি জড়িয়ে জবুথবু হয়ে শুয়ে থাকে। এসকল করুণ দৃশ্য বিশেষ করে রেলস্টেশন ও ফুটপাতে দেখা যায়। এদের কথা স্মরণ করেই কবি শামসুর রহমান বলেছেনঃ

‘শীত সকালে লোকটা কাঁপে,
কাঁদে সবার পা ধরে।
একটা শুধু ছিল জামা,
তাও ছিঁড়ল ভাদরে।
হি-হি শীতে থাকে পড়ে,
ডাকে না কেউ আদরে।

উপসংহার ও আমার অনুভূতিঃ

সর্বশেষে এটাই বলব, শুষ্ক ও স্নিগ্ধ, আনন্দ ও আপদ সবমিলিয়ে শীত ঋতু খুবই মুগ্ধকর ও সুখময়। ব্যক্তিগতভাবে এই ঋতু নিয়ে অনুভূতিগুলো আমার কাছে খুবই প্রিয়। শীতকালের শীতলতায় আমার মিশে যেতে খুবই প্রীতিকর লাগে। সবমিলিয়ে এই ঋতু খুবই সুখকর ও বর্ণিলতা সমৃদ্ধ।

শিক্ষার্থী, জামিআ ইসলামিআ আরাবিয়া, বলিয়ারপুর, এ, ঢাকা।

শীতের সকাল

• মো. আশিকুল্লাহ মাহমুদ

শীতের ঘুম যেন একটু ভিন্নরকম। মনে হয় ঘুমের কোনো অন্ত নেই! বিশেষ করে যখন 'দারুল ইকামা' সাহেব ডাকতে আসেন, তখন যেন ঘুম আরও বেড়ে যায়। উস্তাদজির ডাকে ঘুম থেকে উঠে, জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি, পরিবেশ কুয়াশায় অন্ধকার হয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন এখনও সকাল হয়নি। কিন্তু নামাজ তো পড়তে হবেই। কারণ তা ফরজ বিধান। ফজরের নামাজ। ঠান্ডা জল দিয়ে অজু করে আসলাম। মনে হচ্ছে যেন বরফ গলিত পানি দিয়ে অজু করলাম। শরীর জমে যাচ্ছে। নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হতে হতে ভাবলাম, আজ শুক্রবার। অন্যদিনের তুলনায় ব্যস্ততা কিছুটা কম। তবে নিজস্ব কাজকর্ম অনেক বেশি। তাড়াহুড়ো নেই বললেই চলে। আবার বিশ্রামের সুযোগ আছে পর্যাপ্ত। ভাবলাম বাহির থেকে হেঁটে আসি। সেই ভাবনা নিয়ে বন্ধুকে ইশারা করে বললাম, জুতা নিয়ে বের হও। বাইরে থেকে হেঁটে আসি।

বন্ধুকে নিয়ে পিচঢালা রাস্তার উপর হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম, আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত। যা দিয়ে আমাদের চারপাশ ঢেকে রেখেছেন। চারপাশে ঘন কুয়াশা ও রাস্তার দুইপাশে সবুজ ঘাস। শীতের সকালে ঘন কুয়াশায় যখন সবকিছু ঢেকে যায়, তখন প্রকৃতিকে অপূর্ব সুন্দর মনে হয়। প্রকৃতির মধ্যে এক নীরব সৌন্দর্য দেখা যায়। শীতের সকালে প্রকৃতি আশ্চর্য নিস্তব্ধতায় মগ্ন হয়ে পড়ে। মাকড়সার জালে, টিনের চালে, গাছের ডালে ও ঘাসের ডগায়—শিশিরবিন্দু জমে থাকার মনোরম দৃশ্য শীতের সকাল ছাড়া আর কখনো চোখে পড়ে না।

ঘন সাদা চাদর মুড়ে থাকা প্রকৃতির বুক চিকচিক করে। প্রকৃতি হয়ে ওঠে সতেজ। সরষে ক্ষেত মুখরিত হয় মৌমাছির গুঞ্জনে। কুয়াশার চাদর সরিয়ে সূর্য যখন উঁকি দেয়, তখন স্নিগ্ধ আলোয় ঝলমল করে কুয়াশায় ভেজা প্রকৃতি। রোদের কিরণ পড়ছে আর কুয়াশা মুক্তার ন্যায় ঝলমল করছে। পিচঢালা রাস্তা কুয়াশায় ভিজে কালো হয়ে আছে।

আল্লাহর এই অগণিত নিয়ামত দেখে কৃতজ্ঞ হলাম। কিন্তু শীতের সকালটা শহরবাসী ঘুমের মধ্যেই কাটিয়ে দেয়। আফসোস! সুন্দর এই প্রকৃতি দেখা তাদের কখনো সুযোগই হয় না। শীতের সকালে তাদের লেপের উষ্ণতা থাকে। এদিকে গ্রামের সাধারণ মানুষ, লেপের উষ্ণতা ছেড়ে কাজকর্মে ফিরে যায়। শহরের মানুষদের সূর্যোদয় দেখা, সূর্যাস্ত দেখা ও শীতের সকালের কুয়াশা দেখার মতো সৌভাগ্য হয় না। তবে শহরের লোকেরা রংবেরঙের শীতের কাপড়ের মাধ্যমে শীতের সকালকে বরণ করে। কোট, ব্লেজার, জ্যাকেট, সোয়েটার, টুপি, চাদর ও মাপলার ইত্যাদি। শীতের সকালে শিশিরভেজা সোনালি রোদের স্পর্শ কার না ভালো লাগে? সুবিধা-অসুবিধা দুয়ে মিলে শীতের সকাল আমাদের জীবনে প্রতিবছর দুই মাস সময় অন্যরকম ভালো লাগার অনুভূতিতে আমাদের হৃদয়কে আনন্দিত করে।

ময়মনসিংহ, সদর

প্রকৃতির কোমলতা

● খায়রুল বাশার রায়হান

শীতের সকাল এক অপার্থিব সৌন্দর্যের অনুভূতি, যা প্রকৃতিকে ঢেকে দেয়, সাদা কুয়াশার কোমল চাদরে। চারপাশ যেন শান্ত ও নিস্তব্ধ। তবে সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করে কানে ভেসে আসে ভোরের পাখিদের মধুর কিচিরমিচির। এ শব্দ শুধু শব্দ নয়; এ যেন প্রকৃতির একান্ত নিবেদন, প্রভুর প্রশংসায় তাসবিহ-কলরব। পুকুরের পাড়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভোর প্রভাতে সেই মুগ্ধতা হৃদয়ে অনুভব করা এক অতুলনীয় অনুভূতি। পুকুরের জলে মাছেরা আনন্দে মগ্ন; তাদের খাবার দিতে আসা জেলের করুণাময় হাত যেন জীবনের এক নিঃশর্ত সেবা। কত আপন করে সে তাদের লালন-পালন করছে শুধু জীবিকার জন্য। ইস! আমি যদি আমার জীবনটাকে লালন করতে পারতাম নিবেদিত প্রাণ হয়ে। অঙ্কুর থেকেই আপন করে যত্ন নিতে পারতাম!

সূর্য যখন ধীরে ধীরে কুয়াশার আড়াল ভেদ করে আকাশে ওঠে, চারপাশের জগৎ যেন এক নতুন গল্পের যাত্রা শুরু করে। শিশিরভেজা ঘাসে পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে সেই শীতল অনুভূতি শরীরে শিহরণ তোলে। শীতের এ সকালের প্রতিটি মুহূর্তে বাতাসে মিশে থাকে অদ্ভুত এক কোমলতা। এমন মুহূর্তে যদি প্রিয়জনের হাত ধরে হাঁটা যেত, বহুদিন ধরে জমে থাকা কথাগুলো বলা যেত, চাওয়া-পাওয়া নিবেদন করা যেত! তাহলে সেই পথে হেঁটে যাওয়ায় সত্যি স্বর্গীয় অনুভূতির ছাপ পাওয়া যেত। ঘন কুয়াশার আবেশে দুইজন মানুষের নিঃশব্দ পদচারণা, শীতল বাতাসে হাতের উষ্ণতা এক অদ্ভুত শান্তি এনে দেয়। সাদা কুয়াশায় মোড়া প্রকৃতির মাঝে এই মুহূর্তগুলো যেন স্মৃতির মণিকোঠায় চিরদিনের জন্য সঞ্চিত হয়ে থাকে।

কল্পনা করি, এই পথচলা যদি প্রিয় নবিজি সা.-এর সঙ্গে হতো। তাঁর স্নেহময় হাতের উষ্ণতা, তাঁর পবিত্র মুখের সান্নিধ্য; হৃদয়ে প্রবাহিত সেই অনুভূতি হয়তো আমাদের আত্মার গভীরতম কোণে শান্তির আলো ছড়িয়ে দিত। এই হেঁটে যাওয়া শুধু এক পথচলা নয়, বরং আত্মশুদ্ধি ও পূর্ণতার পথে যাত্রা। অন্তহীন জীবনের পাথেয় জোগাড় করা।

তবে শীতের সকাল শুধু মধুর নয়, আছে এর কঠোরতাও। গরম লেপ ছেড়ে কাজে বের হওয়া সহজ নয়। কিন্তু যারা ভোরের আকাশের নিচে নিজেদের জীবন সংগ্রামে মগ্ন হন, তাদের দৃঢ়তা ও পরিশ্রম আমাদের জীবনযুদ্ধের মন্ত্র শেখায়। কৃষকের খেতে যাওয়া, শ্রমিকের কাজে যাত্রা, শিশুর স্কুলমুখী ছুটে চলা—এগুলো নিছক কাজ নয়; এগুলো হলো প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করার অপরিসীম দৃষ্টান্ত। তাদের এই ত্যাগে নিহিত আছে জীবনের মহান শিক্ষা-সংগ্রাম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সফলতার পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা।

শীতের সকালে প্রকৃতির কোমলতা যেমন হৃদয় ছুঁয়ে যায়, তেমনই তার কঠোরতা আমাদের শিখিয়ে দেয় কীভাবে প্রতিকূলতাকে জয় করতে হয়। এ এক পরম প্রার্থনা, যেন প্রকৃতি আর মানুষের এই মিশ্রণে প্রতিটি দিন হয়ে ওঠে আলোকিত, স্মৃতির পাতায় অমলিন।

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

শীত এবং আমার শৈশব

জুবাইর আল হাদী

ছয়টি ঋতুর চোখ ধাঁধানো, মন মাতানো এক অবাক করা সবুজ দেশ, বাংলাদেশ। বিস্ময়কর এ দেশের প্রকৃতি। স্বপ্নের চেয়েও সুন্দর। এজন্যই কত কবির চোখে বাংলাদেশের রূপ-বৈচিত্র্য, প্রকৃতি ও সৌন্দর্য উঠে এসেছে নানানভাবে। নানান উপমায়। নানান বাক-ভঙ্গিমায়। যেমন:

‘সোনার কাঠি রূপোর কাঠি,
তার চেয়ে যে অনেক খাঁটি।
দুধের বাটি উপচে পড়া শস্য-শ্যামল দেশ,
সাতটি রঙে ধাঁধা আমার সোনার বাংলাদেশ।’

এটা বলার পরও তৃপ্ত হয় না মন। আরও বলতে ইচ্ছে হয়। শুনতে ইচ্ছে হয়। কথায়, কবিতায় বা গল্পে যতটুকু বলা যায়, তার চেয়েও হাজার গুণে সুন্দর আমাদের প্রাণপ্রিয় এই বাংলাদেশ। সুন্দর এর প্রতিটি ঋতুই।

বছরের পঞ্চম ঋতু ‘শীত’। পৌষ ও মাঘ মাস নিয়েই শীতের আসর। শীতের সাথে বাংলার অন্য কোনো ঋতুর সামান্যতমও কোনো মিল নেই। একেবারেই আলাদা। শীতকালে বাংলার প্রকৃতি একবারেই বদলে যায়। গ্রাম-গঞ্জের চেহারা তো হয়ে যায় আরও ভিন্নতর। মাঠ, ঘাট ও সুদূর-অদূর কুয়াশার চাদরে ঢাকা থাকে সারারাত। সকালে কখন যে সূর্য ওঠে, তাও ঠিক বোঝা

যায় না। ভোরের সূর্যকেও কুয়াশার চাদরে মুড়ে লুকোচুরি খেলে শীত।

সূর্যটা পশ্চিমে ঢলে পড়ার আগেই আবারও কুয়াশা ডানা মেলে। কুয়াশার এই নিত্য খেলা চলে শীতের পুরো দুটি মাস। শীতকাল মানেই তো শীতের দাপট! সেটাই স্বাভাবিক। তা না হলে আর শীতকাল কেন!

সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত ঝরতে থাকে শিশিরকণা। শিশিরভেজা প্রকৃতি, বিস্তীর্ণ মাঠে হলুদ সরষে ফুল, দুই ধারে জমে থাকা শিশির, কুয়াশাচ্ছন্ন ঘাসের পাতা ও কচুরপাতা সূর্যোলোকে হীরকের মতন ঝিকিমিকি ঝলমলানি। এমন দৃশ্যে অনায়াসে এসে যায় কবিতা দু'লাইনের মালা—

'সকালে সোনার রবি করে ঝিকমিক,
সবুজ ঘাসের পাতায় শিশিরকণা করে চিকচিক'।

শীতের সকালে পুকুরের দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। যেন পুকুরের বুকজুড়ে ভাপ উঠছে। মনে হচ্ছে পুকুরটাকে বড়ো একটা কড়াইয়ের ওপর চাপিয়ে জ্বাল দিচ্ছে কেউ। দেখতে যত মজাই লাগুক না কেন, কখনো ওই পুকুরে ঝাঁপ দেওয়ার দুঃসাহস দেখাইনি। কারণ তার পানি এত ঠান্ডা যে, মনে হবে পা-দু'টি যেন পানির নিচ থেকে কেউ টেনে ধরেছে। শুধু পুকুরের পানি কেন? শীতের দাপট চলে সর্বত্র। এজন্যই তো সন্ধ্যা হওয়ার আগেই ছোটো-বড়ো সবাই গায়ে জড়িয়ে নেয় রাজ্যির কাপড়-চোপড়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে রাখে শীতের ভয়ে। তাতেও কি রক্ষা হয়? হয়তোবা শহরে কলকারখানার কারণে শীতের প্রভাব সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু গ্রামে দেখা যেত ভিন্ন চিত্র।

সকাল-সন্ধ্যায় ঘুঁটি কিংবা নাড়ার আগুন জ্বালিয়ে সবাই তার পাশে গোল হয়ে বসে আগুন পোহাতাম। সে এক মজার দৃশ্য! কবির চোখে শীতটা কেমন? কেমন তাঁর অনুভূতি? না-কি তিনিও কাঁপছেন শীতের দাপটে আমাদের মতো। এজন্যই হয়তো কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'মানিনী নায়িকার মানভঙ' কবিতায় খানিকটা কৌতুক ও হাস্যরসে বর্ণনা করেছেন—

'বসনে ঢাকিয়া দেহ গুঁড়ি মেরে আছি।
উঁহুঁ উঁহুঁ প্রাণ যায় শীত গেলে বাঁচি।
হাসিয়া নাগর কহে, খোল প্রাণ মুখ।
শীত-ভীত হয়ে এত ভাব কেন দুখ।
ছয় ঋতুর মধ্যে শীত করে তব হিত।
হিতকর দোষী হয় একি বিপরীত।'

শীত নিয়ে এ ধরনের বহু ছড়া-কবিতা লিখেছেন আমাদের দেশের কবিরা। এখনও লেখা হচ্ছে। আগামীতেও হবে। কারণ শীত এমন একটি ঋতু, যাকে উপেক্ষা করতে পারেন না কোনো কবিই।

শীতে খেজুরের গুড়ের যে স্বাদ তারও তুলনা হয় না। খেজুর রস এবং গুড় দিয়েই ঘরে

ঘরে তৈরি হয় পিঠা ও পায়েস আরও কত কী! পুরো গ্রামজুড়েই খেজুর রসের মন মাতানো মৌ মৌ গন্ধ। ধুম পড়ে যেত গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী সে ভাপা পিঠা খাওয়ার। বাংলা বালার হাতের সুনিপুণ পটুতায় ঢাকনা ঢাকা হাঁড়ির ওপরে একরতি কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে মোড়ানো উঠছে আতপচালের গুঁড়ো ঢাকা, নতুন খেজুর গুড় আর নারিকেল দেওয়া ছোটো বাটি। নামছে এক একটা ভাপা পিঠা।

এ যেন পরম আদর, স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসার এবং পারিবারিক অটুট বাঁধনের এক চিরায়িত গ্রাম বাংলার চিরচেনা শীতকালীন ছবি।

এ সময় আরও অনেক পিঠা তৈরি করে থাকে মানুষ। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—চিতই, দুধচিতই, বড়াপিঠা, পাটিসাপটা, দুধপুলি, ক্ষীরপুলি, চন্দ্রপুলি প্রভৃতি পিঠার বেশ প্রচলন রয়েছে।

শীত এলে অবাক করা বিষয় ঘটে আমাদের এই দেশে। দেশীয় পাখি—ঘুঘু, শালিক, বাবুই, চড়ুই, দোয়েল, বক, মাছরাঙা প্রভৃতি তো আছেই। তাদের সাথে যুক্ত হয় পৃথিবীর বহু দেশ থেকে আসা অতিথি পাখির ঝাঁক। তারা আসে দলবেঁধে। ঝাঁকে ঝাঁকে। এদের মধ্যে থাকে বিভিন্ন জাতের হাঁস, সরাল, নীল ডানা হাঁস, জোয়ারি, সাদা সারস, ধূসর বটের পাখি, চখাচখিসহ কত নাম না জানা পাখি! পুরো শীতকাল জুড়েই হাওর-বাঁওড়, বিল-ঝিল সরব হয়ে থাকে দেশীয় ও অতিথি পাখির কলগুঞ্জন। কিছু দুষ্টু লোক এই সময় অন্যায় ও নিষ্ঠুরভাবে শিকার করতে থাকে দেশীয় ও অতিথি পাখি। সত্যিই এটা কষ্টের। বেদনার। এভাবে নির্বিচারে অতিথি পাখি শিকার করা আদৌ কি উচিত!

শীতের সূর্য! ভোরে নাগালে পাওয়াই দুষ্কর। শীতের সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত হলো শীতের সকাল। ছোটোবড়ো সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম, কখন রোদ পাব! কখন রোদে বসে শরীরটা একটু গরম করে নেব! কখন! প্রতীক্ষার পালা চলতে থাকে। বিশেষ করে যারা গরিব, অভাবী—যারা শীতের কাপড় কিনতে পারে না—তাদের তো কষ্টের কোনো সীমা থাকে না। কনকনে শীতে তরতর করে কাঁপতে থাকে তারা। রাতের জন্য তেমন লেপ-কাঁথাও থাকে না তাঁদের। শীতটা তাদের বেশ কষ্টেই কাটে। যাদের সামর্থ্য আছে, তারা যদি ওই অসহায়দের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে তাদের কষ্ট কমে যায়। আমাদের কিন্তু তেমনই দরদি এবং সহমর্মী হওয়া প্রয়োজন।

শীতের আরেকটি মজাদার বিষয় হলো—ভ্রমণ। দলবেঁধে পিকনিক, বনভোজন ইত্যাদির জন্য খুবই উপযুক্ত ঋতু এটা। কারণ গরম নেই, ঝড়-বৃষ্টি নেই, প্রকৃতির পাগলামো নেই, কাঠফাটা রোদ নেই।

ঝামেলা বা ভয়ের কোনো কারণই নেই শীতে। সুতরাং বন্ধুবান্ধব মিলে, দলবেঁধে এ ধরনের আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠতে অসুবিধা কোথায়। অসুবিধা নয় বরং সুবিধাই বেশি। তাই তো শীত এলেই গোটা দেশ যেন মেতে ওঠে আনন্দে।

পাড়ার ছেলেরা একসঙ্গে বনভোজনে মেতে উঠতাম। নামটা বনভোজন হলেও আমাদের কাছে 'বনভাত' নামে সমাদৃত ছিল। বাড়ির দক্ষিণ দিকের ছোট্ট মাঠে জমতো আমাদের বনভাত। লাকড়ি সংগ্রহ করা হতো বিভিন্ন বাগান থেকে। আমার দাদি থাকতেন এই আয়োজনের প্রতিনিধি। তার দিকনির্দেশনায় পরিচালিত হতো আমাদের 'বনভাত' নামক বনভোজন।

শীত মৌসুমে আমাদের প্রাণপ্রিয় এই সবুজ বাংলা সেজে ওঠে আরও নতুনভাবে। জাগিয়ে তোলে সে গোটা দেশ এবং জাতিকে। দোলা দিয়ে যায় হৃদয়ের ঢেউ টলোমলো পদ্মদিঘি। মানুষ কি শুধু ভয়েই কাঁপে? শীতে কাঁপে? না, বরং খুশি এবং আনন্দেও মানুষ সমান শিহরিত হয়। পুলকিত হয়। অপার আনন্দে কেঁপে কেঁপে ওঠে কখনো-বা মানুষের হৃদয়-মন। শীতও তেমনি একটি ঋতু। যে ঋতু বাংলার মানুষের হৃদয়কে শীত এবং আনন্দে মিলেমিশে কাঁপিয়ে তোলে আমূল।

শিক্ষার্থী: ঝালকাঠি এন এস কামিল মাদরাসা, বিজ্ঞান বিভাগ।

কুয়াশার মখমল দিন

● **খালিদ নিশাচর**

অগ্রহায়ণের শেষ বিকেলে উত্তুরে হিম হাওয়ার ডানায় ভেসে আসে শীতের আগমনি বার্তা। গোধূলি বিকেলে দিগন্তে স্পষ্ট হতে থাকে কুহেলিকার ছায়া। ধীরে ধীরে সে ছায়া গাঢ় হয়। যেন চরাচর জুড়ে উড়ে বেড়ানো শুভ্র মেঘের ভেলা। রাতের আঁধারে সেই মেঘ ঝরে পড়ে টিনের চালে, বাঁশ ঝাড়ে, গাছের পাতায় পাতায়। কী অদ্ভুত এক ঘোরলাগা সিম্ফনি। এরই সাথে যুক্ত হয় হিমালয় থেকে ধেয়ে আসা শীতল নিশ্বাস। আমরা তখন উষ্ণতার আড়াল খুঁজতে থাকি গরম পোশাক, কম্বল আর লেপের আড়ালে।

মনে পড়ে শীতের সকালে মায়ের ডাকে প্রচণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও জেগে ওঠার দিনগুলো। গরম পানিতে অজু করে জ্যাকেট ও মাফলার জড়িয়ে মক্তবের প্রস্তুতি নেওয়া। খানিক বাদেই সমবয়সি সঙ্গীদের ডাকে কুয়াশার পর্দা ভেদ করে ছুটে চলা মক্তবের পথে। আমপারা আর মাসনুন দোয়ার সুরে মুখরিত

শীতের সকাল। তারপর মক্তব ছুটি হলে মায়ের পাশে রান্নাঘরের উনুনের কাছে বসা। মা রাতের বেঁচে যাওয়া ঠান্ডা ভাত মরিচ, পিঁয়াজ, হলুদ আর ডাল্ডা দিয়ে ভাজতেন। কত আগ্রহ আর স্বাদ নিয়ে সে ভাত খেতাম আমরা। সত্যিই সেই স্বাদের কাছে উন্নত রেস্টুরেন্টের বিরিয়ানিও নস্যি।

আর যেদিন মক্তব ছুটি থাকত, সেদিন ভোরের আলো ফুটতেই আমরা চাচাত ভাই-বোনেরা মিলে উঠানে পাটি মেলে রোদ পোহানোর আয়োজন করতাম। সাথে অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসাবে থাকত গুড়-মুড়ি। গল্পে গল্পে জমে উঠত শীতের শৈশব।

শীতের দিনে মেহগনি বনের গা ছুঁয়ে বয়ে চলা হিম বাতাস রৌদ্রোজ্বল দুপুরকেও কেমন শীতল করে রাখে। শীতের সময় ভোরবেলা নদী-পুকুরের পানি কেমন ধোঁয়া ওঠা বরফ হয়ে থাকে। দূর থেকে দেখলে গরম চা কিংবা কফির স্রোত বলে ভ্রম হয়। সেই পানির শীতলতায় রৌদ্রতাপ কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না, শুধু ধোঁয়া সরানো ছাড়া। দুপুরে গোসল করতে গেলে আমরা দীর্ঘক্ষণ গল্পে কাটাতাম নদীর পাড়ে। একসময় ঠান্ডা ভীতি জয় করতে ঝাঁপিয়ে পড়তাম একসাথে দলবেঁধে।
দিনেরও বুঝি শীত লাগে। তাইতো শীতকালে দিনগুলো ব্যস্ত হয়ে পড়ে দ্রুত রাতের চাদরে গা ঢাকা দেওয়ার জন্য। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরা কৃষকের ন্যায় দিনেরও যেন ফুরাবার তাড়া। এইজন্যই বুঝি শীতের দিনগুলো এত ছোটো হয়। দেখতে দেখতে মোমের গলে যাওয়া যেন।

শীতকালে বিকাল থেকেই বড়োরা আমাদের শীতের পোশাক পরার জন্য তাগিদ করতেন। আর আমরা তখন ব্যস্ত থাকতাম খেজুর গাছ কাটার পর ফেলে রাখা খোলস কুড়াতে। গাছির গাছ কাটার সময় গিয়ে ভিড় করে থাকতাম। কখনো-সখনো বাড়তি লাভ হিসাবে পেতাম এক-দু টুকরো চুমুর। তারপর মাগরিবের সময় যখন অন্ধকার নেমে আসত, পাতলা কালো ওড়না জড়িয়ে, তখন আমরা সংগৃহীত খোলসগুলো নিয়ে হাজির হতাম বাড়ির অদূরের আঙিনায় কিংবা খেতে। কেউ আনতাম দড়ি, কেউবা দিয়াশলাই

আর কেউ সংগ্রহ করে আনত কচুপাতা। শুরু হতো আমাদের ফুলকি উড়ানো খেলা। ফুটো করা কচুপাতায় যখন পুড়ানো খোলস বেঁধে ঘুরানো হতো, মনে হতো যেন আতশবাজির মেলা। আহা! কী দারুণ রঙ্গিন ছিল আমাদের ছেলেবেলার শীতের সন্ধ্যা।

শীতের সময় ফসলের মাঠ ছেয়ে যায় হলুদ সরিষা ফুল আর কলাই শাকে। গ্রাম্য বালিকাদের আঁচলে করে শাক তোলার দৃশ্য রুপসি বাংলার মায়া বাড়িয়ে দেয়। কোনো কোনো বন্ধের দিন আমরা ছোটো পাতিল আর দিয়াশলাই নিয়ে চলে যেতাম মাঠে। মুঠি মুঠি শিম তুলে সেই পাতিলে সিদ্ধ করে খাওয়ার দিনগুলো যে কত মধুর ছিল!
এর পাশাপাশি শীত মানে ঐতিহ্যবাহী 'রস-চিতই'-এর দিন। কুয়াশাভেজা সকালে রসে ভেজানো ঠান্ডা চিতই পিঠা শরীরে কাঁপন ধরানো সুখ এনে দেয়। পিঠা খাওয়া হলে পাটখড়ি জালিয়ে গোল হয়ে আগুন পোহানোর আনন্দের কোনো তুলনা কি হয়!

এ ছাড়া শীতের মাঝামাঝি আর শেষের দিকে শৈত্যপ্রবাহ শুরু হলে কয়েক দিন সূর্যের দেখা মেলে না। সারাদিন চারদিকে কুয়াশা মোড়ানো হিম বাতাসের বুনো উল্লাস। এমন দিনগুলোতেও গ্রাম কিংবা শহরে মানুষেরা খড়কুটো আর পাটখড়ি জমা করে আগুন জ্বালিয়ে ছোটো-ছোটো দলবেঁধে আগুনের তাপে আড্ডা জমায়। কী যে হৃদ্যতার পরিবেশ সেসব!

লোহাগড়া, নড়াইল

অনুভব

● মেরাজুল ইসলাম শওকত

ভোর। কানে মুয়াজ্জিনের আজান ভেসে আসছে—'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম'। গভীর ঘুমটা নিমিষেই উধাও হয়ে গেল। প্রচণ্ড শীত। উঠতে এই ধীরজ শরীর বাধা দিলেও ভেতরের আত্মাটা বাধা দেয়নি। রবের দরবারে হাজিরা তো দিতেই হবে।

প্রতিদিনের মতো আজও একই নিয়মে উঠে অজু করে নামাজ আদায় করলাম। মসজিদ দূর হওয়াতে ফজরে তেমন বেশি যাওয়া হয় না। ঘরের এক কোণেই নামাজে মগ্ন হয়ে পড়ি। রবের কাছে চাই তিনিও আমাকে নিরাশ করেন না। কারণ তিনিই তো বলেছেন—'তোমরা আমার কাছে চাও; আমি তোমাদের চাওয়া পূরণ করব।' মানুষের কাছে চাইলে মানুষ রাগ হয়, আর সেই মহান সত্তার কাছে না চাইলে তিন রাগ হন। আহ! তিনি কতই-না দয়াময় মহান। জীবনের খাতায় এত এত গুনাহ জমা থাকার পরও আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন তার দয়ার সাগরে। আর কার কাছে চাইব বলো? আল্লাহর প্রিয় বন্ধুই তো বলেছেন—'দোয়ার চেয়ে বেশি মর্যাদাময় আর কোনো আমল নেই।' তাইতো রবের কাছে চাই।

নামাজ শেষে প্রতিদিনের মতো আজও একটু পায়চারি করার জন্য বাইরে বের হলাম। ঘন কুয়াশা। আলোর উপস্থিতিতে রাতের অন্ধকার যেন ক্রমশ পালিয়ে যাচ্ছে। সে যাচ্ছে আর হয়তো আলোকে বলছে—'আমি আবার ফিরে আসব তোমার অনুপস্থিতিতে। তখন কে আমাকে থামাবে?'

তাদের এই যাওয়া-আসার তর্কেই আমি বাইরে পা ফেলতে লাগলাম। কুয়াশায় আচ্ছন্ন রাস্তাঘাট। প্রকৃতি ঢেকে আছে কুয়াশার প্রলেপে। সবখানে ত্রস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে কুয়াশার দল। হাওয়া শরীর স্পর্শ করামাত্রই যেন শরীর জমে

যায়। চারিদিকে কেমন নিরিবিলি। কোথাও কেউ নেই।

অনুভূতির প্রগাঢ়তায় ভাবনাদের মূলমন্ত্র যেন কেমন ক্রমশ জেগে উঠছিল। অনুভব করলাম আচমকা এক ধমকা হাওয়া যেন আমার ভেতরটা কাতর করে ফেলছে। বুঝতে বাকি রইল না, সে কে। সে তো আর কেউ নয় 'স্মৃতি'!

ও আমার কাছে নির্জনেই আসে। মরে যাওয়া স্মৃতিগুলো যেন আজ আমার সঙ্গে আলাপন করতে চাইছে। আজ ভিন্নরকম এক ঝুলি স্মৃতি নিয়ে ভাবনায় উদিত হলো সে। সে আমাকে বলছে

—কিরে? আমাকে তোর মনে পড়ে না?

—মনে পরে তো। তবুও আজ কেন জানি একটু অন্যরকম। অন্যরকমভাবে আমাকে জাগিয়ে তুলছে।

—তুই না বড়ো হতে চেয়েছিলি? এবার খুশি তো?

—মোটেও খুশি হইনি। একান্ত সময়েই কেন জানি স্মৃতিগুলো আমায় তাড়া করে। সময় তো থেমে থাকে না, কালের পরিবর্তনে রংবদল তো হবেই। মানুষ আসবে বিদায় নেবে, এই তো দুনিয়ায় খেলা। সময় তো সময়ের গতিবেগেই চলবে, তাই না? অতীত ভেবে আর কী-বা হবে। স্মৃতিগুলো থাক না ডায়েরির পাতায় সজ্জিত।

সেসব কথা ভাবছি আর রাস্তার এক কোণ ধরে মাটিতে লেপটে থাকা সবুজ ঘাসে পা ফেলে হাঁটছি। আমি দেখছি ঘাসের ডগায় শিশিরকণাগুলো যেন সূর্যের আলোর কিছুটা আভাস পেয়ে ঝকমকিয়ে উঠছে। বিপদের আগবার্তা টের পেয়ে যেন তারা ম্লান হয়ে গেল।

আমার পায়ের আলতো ছোঁয়ায় শিশিরকণাগুলো যেন একরাশ ব্যথা নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। আমি তাকিয়ে দেখছি আর মনের ভেতর তাদের শব্দহীন কথাগুলো ফুটিয়ে তুলছি। পা ফেলতে ফেলতে খানিক পর দূরের আবছা হাওয়ায় মক্তবগামী শিশুদের আনাগোনা দেখতে পাচ্ছি। শীতের কাঁপুনি খেতে খেতে তারা এক হাতে বুকে চেপে কায়দা-কোরআন আর অন্য হাতে মক্তবের বারান্দার ঠান্ডা মেঝের শীতের আর্দ্রতা দূর করার জন্য জায়নামাজ নিয়ে মক্তবপানে ছুটে চলছে।

আমি অবাক হয়ে দেখছি আর ভাবছি আহা! আমিও এককালে এমনই ছিলাম। সকালে গভীর ঘুমে যখন মগ্ন থাকতাম, তখনই মায়ের ডাকে বন্ধ চোখগুলো যেন একবুক ব্যথা নিয়েই তার দোর খুলত। মায়ের সেই সকালের ডাক আগের মতো কানে এসে ধমকায় না। শোনা হয় না ঘুম ভাঙার মতো পাখির ডাক। যে সকল পাখির গানে রোজ রোজ ঘুম ভাঙত; সেসব এখন আর নেই। একদিন হারানোর পর ফিরেনি আর।

বাড়ির কোণে আম গাছটাও আজ বিলীন। তার ডালে কতই-না দোল খেতাম। আজ তারও কোনো ইয়ত্তা নেই। পুকুরের পাতিহাঁসগুলোর ডানা ঝাঁপটানোও আজ দেখতে মন চায় না। পাখির ছানাগুলো যেন আজ আপন মনে আকাশে উড়াল দিচ্ছে। এভাবে চলে আসছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র। অনুভবে আজও আমাকে মনে করে উদাস করে ফেলে। আহা! কত তাড়াতাড়িই না বড়ো হয়ে গেলাম।

সেকালে পাড়ার বন্ধুদের সাথে বিকেলে মাঠে খেলায় মত্ত থাকা, পাঠের সময় হলে একজন আরেকজনকে ডেকে নিয়ে যাওয়া। আহা! মনে পড়ে সেদিনের কথা, যেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরতাম। মনে পড়ে বৃষ্টি ভিজে আম কুড়ানোর সময়ের কথা। বন্ধুদের সাথে বন-বাদাড়ে?? ছুটে চলা নাটাই হাতে দূর নীলিমায় বাতাসে ঘুড়ি উড়ানো। আবার বিকেল হলে বাবার হাত ধরে হাটে যাওয়া। অবসরে বন্ধুদের সাথে গল্পগুজব করা। আধুনিক যুগের খপ্পরে?? পড়ে তাও আজ বিলীন। সময়ে অসময়ে বড়োদের কছে কতই-না বাহানা আর আবদার। এ সবই যেন আজ বছরের পর বছর বদলে ফেলা ক্যালেন্ডারের মতো কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

এখন শিশুদের মতো কিছু চাওয়ার জন্য মন ব্যকুল হয় না। বলা হয় না—'বাবা তোমার হাত ধরে ঘুরতে যাব।' বলা হয় না বোনকে—'তোমার সাথে নতুন করে আবার পুকুরে সাঁতার কাটতে নামব।' ভাইয়ের কাঁধেও এখন আর চড়া হয় না। সেই কাঁধ এখন আমাকে নিয়ে ঘুরতে যাবে তার অবকাশ নেই। আজ সেটা সংসারের হাল ধরতে ব্যস্ত।

আজ তার হাত ধরেও পদব্রজে ছুটতে কোনো জো নেই। সবই আজ-কালের পরিবর্তে নিঃশেষ হয়ে গেছে। আজ পকেটে হাজার টাকা থাকলেও সেই ছোটোবেলার দু'টাকার নোটটির কথা মনে হলেই যেন এই টাকাগুলো ওর কাছে তুচ্ছ মনে হয়। ছোটোবেলার দু'টাকা দিয়েই যেন আমি দুনিয়ার সুখ কিনতাম। আজ হাজার টাকার নোটেও তেমন কোনো সুখ নেই। নেই ছোট্টবেলায় পাওয়া সেই ঘ্রাণ।

টাকা কেবলই যেন কাগজ। সে আজ সুসময়ের বন্ধু। প্রয়োজনের প্রিয়জন। টাকার জন্যই আজ অহরহ বন্ধন ছিন্ন হচ্ছে। ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। সেই টাকার জন্যই আজ সন্তান বাবাকে চিনছে না। সেই আধুনিকা মা টাকার জন্যই ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছে তার নাড়িছেঁড়া ধনকে। পৃথিবী কত নিষ্ঠুর। সবই আজ

টাকার কাছে বিক্রি। টাকাই যেন আজ সবকিছু।

এসব ভাবতে ভাবতেই কখন যে, হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ চলে এসেছি, ভাবতেই মন বিষণ্ন হয়ে উঠল। তাকিয়ে দেখছি পায়ের সাথে পা মিলিয়ে কতদূরেই না চলে এলাম। পরক্ষণেই বাড়ি ফেরার পথ ধরে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। এতক্ষণে সূর্যিমামাও তার পুরো আলোকরশ্মি দিয়ে চারদিক ফরসা করে ফেলেছে।

মনে জাগান দিলো আরও কিছু স্মৃতি। ফিরতি পথে যাচ্ছি আর ভাবছি—কালের পরিবর্তে হারিয়েছি কত প্রিয় মানুষদের। এখন চেনা মানুষজন আর নেই। সবাই যেন হারিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন এক নতুন পৃথিবীতে বাস করছি।

শৈশবে সেই চিরচেনা সুরে মুয়াজ্জিনের আজান। এখন সেই কণ্ঠে আর আজান শোনা হয় না। এখনও মসজিদের মিনারে আজান হয়; তবে ছোট্টবেলায় সেই কণ্ঠ কেন যেন আমাকে আপ্লুত করে রেখেছিল। আজ মুয়াজ্জিন সাহেবও নেই। সব প্রিয়জন নীরবে নিভৃতে রবের হুকুমে বিদায় নিয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে আজ অনেক কিছুই।

হারিয়ে গেছে সেই তৃপ্তি। যে মনটা প্রিয় কিছু পেলেই আকাশসম আনন্দে লাফিয়ে উঠত; আজ তারও কোনো হদিস নেই। সময়ের পরিক্রমায় ভিড়ের কেন্দ্রবিন্দুও আজ নির্জনতায় রূপ নিয়েছে। একে একে বিদায় নিচ্ছে সবাই। সময় ফুরালে হয়তো আমরাও একদিন বিদায় নেব এই পৃথিবী থেকে। পড়ে রবে আমাদের দুনিয়ায় করে যাওয়া ভালো কাজের স্মৃতিগুলো আগামী প্রজন্মের কাছে।

শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

নাতিশীতোষ্ণ রোদেলা বেলা

মাইমুনা মুন্নি

হেমন্তের গাঙচিলের পালকে ভর করে, শীতল পরশমাখা শিশিরের শব্দের মতো—ধরার বুকে নেমে আসে শীত। কুয়াশার চাদরে ঢাকা শিশিরভেজা পিচঢালা পথ দেখে আনন্দে হর্ষধ্বনি বেজে ওঠে মন মাঝারে। কুয়াশা কন্যারাও ছাউনি গেড়েছে প্রান্তের কোলজুড়ে। উত্তর দিগন্তে হিমালয়ের বরফচূড়া থেকে ছড়িয়ে পড়ে হিমশীতল নিশ্বাস। পৃথিবী কেমন যেন জড়সড় হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। রোদেলা সূর্য যেন শিশিরের বিন্দুগুলো থেকে রংধনুর সাত রঙের আভা ছড়িয়ে দিয়েছে দিগন্তের চৌকাঠে। শীতের হিমেল হাওয়ার গভীর স্পর্শে আমার ঘুম এঁটে দেয় আঁখিদ্বয়ে। অলসতা যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিতে হাত বাড়ায়! তবুও যেন শীত আমার কাছে মোহনীয়তার জাদুকর।

আমার কাছে শীতের আগমন যেন প্রিয়জনের প্রীতির ডোরে নিঃশব্দে মুখ লুকিয়ে রাখার মতো। শীতের প্রভাত সাজে হলদে পাখির ন্যায়। শীতে শিশির ডোগায় বিন্দু বিন্দু জলের প্রণয়ে আমার ছোটো মন নৃত্য করে।

শীতের প্রভাতে রাস্তার ঢালুতে বসে হাঁড়ি থেকে রসের আসা মৌ মৌ ঘ্রাণে হৃদয় কাবু বনে যায়। হায়! মৌসুম তুমিই ঘুরেফিরে আসো, জলবায়ু পরিবর্তনে। এখন যে হেমন্তেও হয় বৃষ্টিসন্ত্রাস। শীত বিলীন হয়ে চলেছে নিঃসীম সীমানায়। শীতের রোদ্দুর এই সুখের পরশ আমাকে ছুঁয়ে দেয়। আমাকে জানান দেয় রোদেলা বেলার।

মাঘের সূর্য রোদের সোনালি উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়েছে মন খারাপে দুয়ারে। রোগাক্রান্ত হৃদয় প্রফুল্লতার সজিবতা টেনে আনে। তবে শীতের প্রস্থান আগমন হয় ফাগুনের। বসন্ত সজ্জিত হয় শতফুলের চরণতলে। মাঝে মধ্যে শীত আমার ভয়ের কারণ হয়। আমি আঁতকে উঠি, বিয়োজনের নোনাজলে। একটা শীতের রোদেলা সকালে চিঠি লিখেছিলে আমায়। পরের শীত এসে নিয়ে নিল তোমায়। এ শীতে আমার আর চিঠি পাওয়া হলো না। নাতিশীতোষ্ণ আর রোদেলা সকাল উপভোগ করা হলো না।

শীতের লতা আমার মনের কথা হিমের রাতে লুকিয়ে রাখে নগ্ন শাখার ফাঁকে ফাঁকে। ফাল্গুনেতে ফুলে রঙিন হবে পৃথিবী। হেসে উঠবে আমার হৃদয়ের মরিচীকা। বসন্তের আগমনি বার্তায়। শীত চলে যায়, পিছন ফিরে চায়, ভেবে নেয় এ কেমন বিদায়! শত খুশির বার্তা ফেলে কাঁদিয়ে পালায়, ফুলেরা ঝরে যায় একবুক বিষণ্ণতায়। শুকনো পাতা তার সঙ্গে উড়ে যায়, উত্তরে বাতাসকে নীরবে কাঁদায়। আপাদমস্তক ঢেকে কুয়াশায় শীত গেল চলে। শুকনো মরা পাতা উড়িয়ে দিয়ে বাতাসের সাথে হারিয়ে যায়, কিন্তু জানিয়ে দিয়ে যায় আগামীর সম্ভাবনা—কুহেলিকা উদ্‌ঘাটন করে আগমন ঘটে ঋতুরাজ বসন্তের-প্রস্থান নেয় শীত।

আমি আবারও অপেক্ষার প্রহর দীর্ঘ করি, নাতিশীতোষ্ণ এক রোদেলা বেলার। ভাঙা ভাঙা শব্দের সমিলে একটা চিঠি পাওয়ার।

দারুল আবরার মহিলা মাদরাসা, শরিয়তপুর

জ্ঞানচর্চায় বইপাঠ: ইসলামী দৃষ্টিকোণ

আব্দুল্লাহ আলমামুন আশরাফী

বাইতুল মুকাররমে ইসলামী বইমেলা শুরু হয়েছে। নানা সংকট ও বহুবিধ অনিশ্চয়তার আঁধার কেটে বইমেলার পর্দা উঠেছে। অন্যান্য সময় রবিউল আউয়ালে মেলাটির আয়োজন করা হলেও এবার রবিউসসানীর শেষার্ধে শুরু হয়েছে। মেলাটি ঘিরে লেখক-পাঠক-প্রকাশকদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো। পাঠকদের হৃদয়ের খোরাক মেটাতে ৮৫টি প্রকাশনী দারুণ দারুণ সব কন্টেন্টের বই নিয়ে এসেছে।

বইপাঠ ও জ্ঞানচর্চা একজন মুসলমানের আত্মার প্রশান্তি বয়ে আনে। মানবজাতির মুক্তির একমাত্র ঠিকানা ইসলাম বইপাঠ ও জ্ঞানচর্চার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছে। মুসলিমমাত্রই জ্ঞানমনস্ক হবে। বইয়ের উষ্ণ সান্নিধ্যে তার প্রাণ জুড়াবে। তরে তরে সাজানো লাইব্রেরীর বইগুলো দেখলেই তার মনে আনন্দের হিল্লোল বইবে। কারণ, বইপাঠের মাধ্যমে সে মুর্খতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকময় রাজপথে এগিয়ে যাবে। পড়াশোনার মাধ্যমে সে আপন রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পরিচয় লাভ করবে। পাঠের স্নিগ্ধ সরোবরে অবগাহন করে মানবতার অহংকার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুরভিত জীবন পাতায় নিজের জীবন পথের পাথেয় খুঁজে নিবে।

কুরআনের প্রথম কথা পড়:

মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের দৃপ্ত শপথ নিয়ে পৃথিবীতে আসা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা মানবজাতির জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার কুরআন মাজীদের প্রথম নির্দেশনাই হচ্ছে "পড়"। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إقرأ باسم ربك الذي خلق

"পড় তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন"। (সূরাতুল আলাক: ০১)

আয়াতে কারীমা থেকে এটা সূর্যালোকের ন্যায় প্রোজ্জ্বল যে, ইসলামে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পড়াশোনা এবং জ্ঞানচর্চা। আর সেই পড়াশোনা হতে হবে আল্লাহর নামে। আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ইসলামকে সুগভীরভাবে জানার এবং দ্বীনের চাহিদানুযায়ী জীবন গড়ার পবিত্র

লক্ষ্যেই জ্ঞানচর্চার সুবিস্তৃত ময়দানে পদার্পণ করতে হবে।

কুরআন সুন্নাহ জ্ঞান মানে কী?

জ্ঞান শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে "ইলম"। কুরআন মাজীদে এবং হাদিস শরীফে ইলম শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ইলম শব্দের অর্থ জানা বা কোন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা। কুরআন সুন্নাহর পরিভাষায় ইলম বা জ্ঞান হচ্ছে- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পরিচয় লাভ করা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তা গভীরভাবে উপলব্ধি করে সে অনুযায়ী জীবন সাজানোর প্রয়াস পাওয়া। সর্বোপরি একজন মানুষ তাঁর স্রষ্টার পরিচয় লাভপূর্বক দুনিয়া আখেরাতে তার জন্য কল্যাণকর ও ক্ষতিকর বিষয়াবলী সম্পর্কে অবগতি লাভের প্রয়াসকে কুরআন সুন্নাহয় জ্ঞানচর্চা হিসেবে অবিহিত করা হয়েছে।

কোন ধরনের বই পাঠ করবো?

কুরআন সুন্নাহয় বর্ণিত ইলম বা জ্ঞানের সন্ধান পেতে আমাদেরকে সর্বপ্রথম কুরআন মাজীদ পাঠ করতে হবে। কারণ, কুরআন মাজীদ আমাদের স্রষ্টা আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেছে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও শক্তিশালী দলীলের মাধ্যমে। কুরআন মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখায়। ইরশাদ হয়েছে- شهر رمضان الذي أنزل فيه القرأن هدي للناس

রমযান মাস সেই মাস যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যে কুরআন মানুষদেরকে সঠিক পথ দেখায়। (সূরা বাকারা: ১৮৫)
কুরআন মাজীদের বিশদ ব্যাখ্যামালা হাদিস শরীফের পাঠে আত্মনিয়োগ করতে হবে। কারণ, হাদিস শরীফের পাঠ ছাড়া কুরআন মাজীদ বোঝা অসম্ভব। অত:পর কুরআন ও সুন্নাহর সারনির্য্যাস ফিকহ তথা যাপিত জীবনে পালনীয় ইসলামি বিধি বিধান বিষয়ে পড়াশোনা করতে হবে। এভাবে কুরআন সুন্নাহ রিলেটেড বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর বান্দাদের উপকার বয়ে আনে এমন বিষয়ে লিখিত বইপত্র পাঠের বিষয়েও কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা রয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব বইপত্র মানুষকে আল্লাহ ও রাসূলের স্মরণকে ভুলিয়ে দেয়, চিন্তা চেতনা ও আখলাক চরিত্র নষ্ট করে সেসব বইপত্র থেকে যোজন যোজন দূরে থাকতে হ ে ব। চরিত্রবিধ্বংসী সাহিত্যের ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না। পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ করে এমন সব কিছু থেকে দূরে থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যারা এ জাতীয় আয়োজন (গান বাজনা বা অশ্লীল সাহিত্যচর্চা ও নিরর্থক বিনোদন) করে

আল্লাহ তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির ধমকিবাণী দিয়ে বলেন- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

"কতক মানুষ এমন, যারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করার জন্য খরিদ করে এমন সব কথা, যা আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীন করে দেয় এবং তারা আল্লাহর পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্‌রূপ করে। তাদের জন্য আছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।"(লুকমান- ৬)

কাদের লেখা বই পড়বো?

কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানে যারা পরিপক্ক তাদের লেখা বইপত্র অধ্যয়ন করতে হবে। যারা জ্ঞানার্জনের ট্রাডিশনাল ধারা তথা দক্ষ বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত একাডেমিক পড়াশোনার স্তরগুলো পার করেছেন এবং সালাফে সালেহীন ও আকাবিরে দ্বীন অর্থাৎ পূর্বসূরী উলামায়ে কেরামের চিন্তা চেতনা ও কর্মপন্থা অনুসরণ করে জ্ঞান-গবেষনায় আত্মনিয়োগ করেছেন তাদের লেখা বইপত্র অধ্যয়ন করা উচিত। কুরআন মাজীদে এমন পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীদের প্রশংসা করা হয়েছে।

বই নির্বাচনে সতর্কতা কাম্য

বই মানেই পাঠের উপযুক্ত না। পাঠ বা অধ্যয়ন হচ্ছে দোধারী তরবারির মতো। এর ভালো মন্দ দুটো দিকই আছে। তাই বই নির্বাচনে সতর্কতা কাম্য। আপনি যদি সাধারণ মানের পাঠক হন তাহলে অবশ্যই একজন দক্ষ সচেতন বিজ্ঞ আলেমের স্মরনাপন্ন হোন। তাঁর নির্দেশনায় বই নির্বাচন করে বই পাঠ করুন। এ ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশনাটা মনে রাখুন-
فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

সুতরাং যদি তোমরা না জান তাহলে আহলুয যিকরকে (কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এমন ব্যক্তিবর্গকে) জিজ্ঞেস করে নাও। (সূরা আম্বিয়াঃ ৭)

পাঠের সময় যে বিষয়ে লক্ষ রাখা জরুরী

কোন দক্ষ বিজ্ঞ আলিমের তত্ত্বাবধানে বই নির্বাচনের পর আপনি যখন অধ্যয়ন শুরু করবেন তখন খেয়াল রাখতে হবে যে, কোন বিষয় বুঝে না আসলে বা অস্পষ্ট মনে হলে বিজ্ঞ আলেমদের কাছ থেকে তা বুঝে নিন। নিজের মতো করে বুঝ গ্রহণ করা বা ব্যাখ্যা দেয়ার কোন সুযোগ নেই।

জ্ঞান বৃদ্ধির দুআ করুন

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জ্ঞান বৃদ্ধির দুআ করতে নির্দেশনা দিয়েছেন। এখান থেকেও ইসলামে জ্ঞানচর্চা ও পড়াশোনার গুরুত্ব কত অপরিসীম সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-
قل رب زدني علما

নবী! আপনি বলুন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জ্ঞানে আরো উন্নতি দান করুন। (সূরা তোয়াহা: ১১৪)

কুরআন মাজীদে জ্ঞানীদের প্রশংসা

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলেম তথা জ্ঞানীদের প্রশংসা করে আমাদেরকে জ্ঞানচর্চা ও অধ্যয়নের দিকে পথনির্দেশনা প্রদান করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إنما يخشي الله من عباده العلماء

"নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা আলেম তথা প্রকৃত জ্ঞানী তারাই যথার্থভাবে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে।" (সূরা ফাতির: ২৮)

আর অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ তায়ালার ভয়কে হৃদয়ের গভীরে লালন করে যাপিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাটানো সফলতার অনন্য সোপান। আর যে জ্ঞান মানুষকে আল্লাহভীতির বিমল অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা যোগায় না সেটাকে জ্ঞান হিসেবে অভিহিত করার প্রশ্নই আসে না।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ সুবহানাহু অনেক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। সেই দৃষ্টান্তগুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করার যোগ্যতা আর কারো নয়, কেবল পড়াশোনা করা জ্ঞানবানদেরই আছে বলে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون

আমি মানুষের কল্যাণার্তে এসব দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি। কিন্তু এগুলো বুঝে কেবল তারাই যারা জ্ঞানবান। (সূরাতুল আনকাবুত: ৪৩) আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছেন, কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানে পারদর্শীতা অর্জন করেছেন, এমন একজন মানুষ আর যে কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানে আলোকিত নয় এমন দুজন মানুষ কখনো সমান হতে পারে না। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত ব্যক্তি সফলতা ও মর্যাদায় সর্বোচ্চ চূড়ায় উন্নীত। কুরআন মাজীদে এ বাস্তবতাটিই বিবৃত হয়েছে এভাবে-

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

নবী! আপনি বলুন! যারা জানে (দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান রাখে) আর যারা জানে না তারা উভয়ে কি সমান? (সূরা যুমার: ৯)

জ্ঞানার্জনের উপায়

জ্ঞানার্জনের জন্য বইপাঠ যেমন জরুরী তেমনি কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানে পারদর্শী বিজ্ঞ আলেমদের স্বান্নিধ্য ও তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা, তাদের মজলিসে বসাও জরুরী। স্বাধীন বইপাঠ কখনো কখনো বিপথগামীতার কারণ হয়ে যেতে পারে। জ্ঞানার্জন ও বইপাঠে তাই বিজ্ঞ আলেমদের

পথনির্দেশনা জরুরী। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

সুতরাং যদি তোমরা না জান তাহলে আহলুয যিকরকে (কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এমন ব্যক্তিবর্গকে) জিজ্ঞেস করে নাও। (সূরা আম্বিয়াঃ ৭)

জ্ঞানের সন্ধানে ছুটা ফরয

ইসলাম জ্ঞানচর্চাকে ফরজ করেছে। যাপিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে একজন মুসলিমের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কি কি নির্দেশনা, সহজ কথায় দ্বীনের বেসিক নলেজ আপনাকে লাভ করতেই হবে। সে লক্ষ্যে আপনাকে জ্ঞানের সন্ধানে বের হতে হবে। হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

العام فريضة علي كل مسلم

ইলম তথা জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। (সুনানে ইবনে মাজাহঃ ২২৪)

অধিক ইবাদতের চেয়েও জ্ঞানচর্চা প্রিয়

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবনটাই ছিলো আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত। তিনি আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। এতো কিছুর পরেও তিনি হৃদয়ে আনন্দিত বোধ করতেন ইলম তথা জ্ঞানচর্চায়। হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব ‡ লন,

فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة

অধিক ইবাদতের চেয়ে অধিক ইলম আমার কাছে বেশী প্রিয়। (মুসতাদরাকে হাকেম-১/৯২) জ্ঞানচর্চা ও বইপাঠ ইসলামের অনন্য সৌন্দর্য্যের প্রতীক। আসুন, ইসলামী বইমেলার এই সুন্দর মুহূর্তে বইপাঠের চেতনাকে শাণিত করি। আলোকময় জীবনবোধে উদ্দীপ্ত হই। জ্ঞানের সৌরভে সুরভিত সমাজ বিনির্মানে এগিয়ে যাই।

লেখকঃ শিক্ষক, জামিয়া গাফুরিয়া মাখযানুল উলুম টঙ্গী গাজীপুর। খতীব, আউচপাড়া জামে মসজিদ টঙ্গী, গাজীপুর।

ভোঁ দৌড় ভোঁ

ফরিদ আহমদ ফরাজী

সকালবেলা ঘাসের ডাগায়
শিশির মুক্তা ঝরে,
চিকচিকিয়ে আলোর গুঁড়ো
সেথা উপচে পড়ে।

শীতের দুপুর শীতলতায়
সূর্য হারায় তেজ,
পাতার আড়ে দোয়েল ডাকে
নাড়ায় পুচ্ছ-লেজ।

শীতবিকেলে ছেলেপেলে
খেলে ভোঁ-দৌড় ভোঁ,
কানামাছি কাবাডি আর
যারে পাবি ছোঁ।

শীতের সন্ধ্যে গাঁও-গ্রামে
হিম কুয়াশার ভিড়,
গাছেগাছে পাখির কূজন
সরব তাদের নীড়।

শীত এলে

কুলসুম বিবি

শীতের আমেজ ছুঁয়ে দিয়ে
হেমন্ত যায় চলে,
প্রকৃতির মন দোলা দিয়ে
শীতের কথা বলে।

শীত এসেছে নরম রোদে
হিমেল হাওয়া বলে,
হরেক রূপে বাগান সাজে
নতুন ফুলে-ফলে।

কচি ঘাসের সবুজ ডগায়
শিশির বিন্দু টলে,
রসের হাঁড়ি ঝুলে থাকে
খেজুর গাছের গলে।

পিঠা পুলি ফিরনি পায়েস
তৈরির ধুম যে পড়ে,
শীত এলে তাই মেতে ওঠে
সবার ঘরে ঘরে।

সূর্য্যি মামা

মুহিব্বুল্লাহ ফুয়াদ

ভোরের রাজা সূর্যি মামা খানিক ফিরে চাও,
নতুন ধানের পায়েস দেবো এসে খেয়ে যাও!
শীত এসেছে দাওয়াত খেতে তাবাসসুমের বাড়ি,
বাঁচতে তারি বিপদ থেকে লেপ প্যাঁচালো ভারী।

চাও না ফিরে এই আমাদের সবুজ শ্যামল গাঁয়!
ফুল ফসল ও পাখপাখালি সবাই তোমায় চায়।
চাইলে তুমি বেলকনিতে, পথের দূর্বাঘাসে,
খুশি হয়ে বিন্দু বিন্দু শিশিরকণা হাসে।

চাইলে তুমি ফুলের মনে রং লেগে যায় রং,
প্রজাপতি ছড়ায় গায়ের আছে যত ঢং।
চাইলে তুমি তোমার চোখের পরশ লাগে তাই,
সেই পরশে হেসে হেসে শীত হয়ে যায় নাই।

সূর্যি মামা সূর্যি মামা একটু যদি চাও!
পুলিপিঠা চিতই পিঠা দেবো এসো তাও।
এসে দেখো আলসে মেয়ে ঘুমে তাবাসসুম,
তোমার সকল উম দিয়ে হ্যাঁ দাও ভেঙে তার ঘুম।

সাতপাই উত্তরপাড়া, কুটুরাগাঁও

এলো রে শীত দেশে

যুবায়ের আল মাহমুদ

হেমন্তেরই আঁচল বেয়ে
এলো রে শীত দেশে,
পাখপাখালি ডানা মেলে
উড়ে হাওয়ায় ভেসে।

হিমেল হাওয়া হাড় কাঁপিয়ে
ছুটে অদূর বাটে,
হাঁসগুলো দেখ নাচে কেমন
তালপুকুরের ঘাটে।

হিম কুয়াশার আস্তরণে
প্রকৃতি মুখ ঢাকে,
ফুলগুলো সব নিজের বুকেই
স্বচ্ছ শিশির মাখে।

ঘাসের ডগায় শিশির জমে
বিন্দু বিন্দু ফোঁটায়,
শীতের ভয়ে গাছের পাতা
মাটির বুকে লুটায়।
হিম কুয়াশার চাদর জড়ায়
প্রভার রাঙা রবি,
প্রকৃতিটা দেখছি যেন
আবছা ধূসর ছবি।

স্বাধীনতার ঘ্রাণ

আবদুল লতিফ

দেশ বাঁচাতে যুদ্ধে গেল
কত মায়ের ধন,
কেউ ফিরেছে কেউ ফেরেনি
স্বাধীনতার ক্ষণ।

কেউ ফিরেছে বীরের বেশে
কারো ফিরে লাশ,
আবার খোকা ফিরবে ঘরে
মায়ের বুকে আশ।

এখনও মা জমিয়ে রাখে
গাছের পাকা ফল,
খোকা ফেরার পথটি চেয়ে
ফেলে চোখের জল।

দীর্ঘ ন'মাস যুদ্ধ করে
হারিয়ে লাখো প্রাণ,
ডিসেম্বরে আমরা পেলাম
স্বাধীনতার ঘ্রাণ।

শীতের বুড়ি

এম আর মাহফুজ

হেমন্তরই শেষের দিকে
দিনটা যেন হয়রে ফিকে,
আসলো শীতের বুড়ি,
কুয়াশারই চাদর দিয়ে
ভরতি করে ঝুড়ি।

মাঠ-ঘাট যায় না দেখা
যদি চলি একা-একা,
বুকে লাগে ভয়,
শীতের বুড়ি আসলো বুঝি
ঢুকবে লোকালয়।

লোকালয়ে ঢুকল বুড়ি
বৃদ্ধ কিংবা নতুন কুঁড়ি
থরথরিয়া কাঁপে;
সবাই এখন চাদর মুড়ায়
শীতের বুড়ির চাপে।

শীত তাড়াতে

খোরশেদ আলম

গাছের পাতা ঘাসের ডগা
শিশির ভেজা তাই,
ঘোমটা পরা শীতের বুড়ি
গরম জামা নাই!

শীত এসেছে সরষে ফুলে
নদী সাগর জলে,
আগুন জ্বেলে শীত তাড়াতে
ছুটছে দলে দলে।

হাত বাড়ালে যায় না দেখা
লাল রবিটা কই,
শীতের পিঠা খেতে সবাই
করে যে হইচই।

কবিতা/ছড়া

বিজয় গাঁথা

মানসী খাতুন

মেঘ সরে বাংলার পুব আকাশে উঠেছিল রবি,
প্রতীক্ষার প্রহর শেষে এসেছিল কাঙ্ক্ষিত ভোর।
মুক্তির সোপান নিয়ে এসেছিল ষোলোই ডিসেম্বর,
খোকা গেল-আর এলোনা, মায়ের কাটেনি ঘোর!

বছর ঘুরে বিজয়ক্ষণ বারেবারেই ফিরে আসে,
বিজয় গাঁথা দেওয়ালচিত্রে, বিজয় সবুজরঙা ঘাসে।
বিজয়ে গাঁথা শহীদ স্মৃতি, বিজয়মাখা মাটির ঘ্রাণে,
বিজয় গাঁথা ফুল কাননে, বিজয় গ্রাম্য মেঠো পথে।

বিজয় গাঁথা হৃদয়ে, বিজয় বাঙালির ভাবনা জুড়ে,
বিজয় গাঁথা মনের গহিনে, বিজয় গাঁথা মুক্তিতে।
বিজয় গাঁথা স্বদেশপ্রেমে, বিজয় গাঁথা শক্তিতে,
বিজয় লাল-সবুজের অঙ্কনে, বিজয় সংগ্রামে।

জামালপুর, ময়মনসিংহ

কবিতা/ছড়া

বিজয়ের আলোর ঝরনা

মাসরুর হাসান

১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের দিন,
লাল-সবুজে রাঙা আমাদের এই বিন।
স্বাধীনতার গান গেয়ে উঠি আজ,
বীর শহিদের ত্যাগে রাঙা এ প্রভাত সাঁজ।

মায়ের মুখে হাসি, চোখে জলধারা,
এই দিন এনে দেয় মুক্তির ইশারা।
পতাকা উড়ে বাতাসে ভরে প্রাণ,
বিজয়ের আনন্দে কাঁপে এই জান।

শত রক্তের বিনিময়ে এসেছিল এই জয়,
ভুলব না কখনো তাদের সেই মধুর লয়।
বীরদের ত্যাগে গড়া এ স্বাধীনতা,
বাংলার বুকে বাজে বিজয়ের মধুর গাঁথা।

শত্রুর শৃঙ্খল ভেঙে গড়েছে তারা পথ,
বিজয়ের এই আলোতে ভরে উঠেছে রথ।
বাংলা আজ বিজয়ী, মাথা উঁচু তার,
শহিদদের গল্পে বাজে বিজয়ের ঝংকার।

এই দেশে মুক্তি, এই দেশে জয়,
স্বাধীন বাংলায় বাজে আনন্দময়।
১৬ই ডিসেম্বর, আলোয় ভাসে দেশ,
বিজয়ের এ গান হৃদয়ে অটল রেশ।

হিমেল হাওয়া

নিলুফা ইসলাম

হিমেল হাওয়া দিচ্ছে দোলা
বহে শীতল বায়ু,
মৃদু পায়ে হেলেদুলে
কমে যেন আয়ু।

সরষে ফুলের হলুদ ছোঁয়ায়
হৃদয় ভরে যায়,
ফুলের রেণু মেখে গায়ে
অলি মধু খায়।

শীতের বুড়ি বেজায় শীতল
অঙ্গে শুভ্র শাড়ি,
খোকন সোনা বেজায় খুশি
যাবে মামার বাড়ি।

দূর আকাশে সূর্যিমামা
লুকোচুরি খেলে,
ঘাসের ডগায় শিশিরকণা
রোদে আঁখি মেলে।

ধনী সাহেব বেজায় খুশি
পিঠা পায়েস খায়,
গরিব দুঃখীর কাজে কষ্ট
প্রাণটা বুঝি যায়।

বিজয়

জাহিদ বিন মোস্তফা

বিজয় আমার রক্তে কেনা
বিজয় আমার বুক,
বিজয় আমার হাসনাহেনা
বিজয় আমার সুখ।

বিজয় আমার পুরো দেহ
বিজয় আমার মন,
বিজয় আমার নেই সন্দেহ
বিজয় আমার পণ।

বিজয় আমার ভাইয়ের দেওয়া
বিজয় আমার প্রাণ,
বিজয় আমার মায়ের গাওয়া
বিজয় আমার গান।

বিজয় আমার যুদ্ধের ফসল
বিজয় আমার শেষ,
বিজয় আমার সকল পাওয়া
বিজয় আমার দেশ।

ফুলের ছড়া

মুহাম্মদ নূর ইসলাম

প্রজাপতির ডানায় চড়ে
ফুল বাগানে ঘুরি,
ফুলের গায়ে আলতো ছুঁয়ে
সুবাস মেখে উড়ি।

ভোর থেকে ফুল পরিবারে
করছে বলাবলি,
শিশির রোদের ঝলকানিতে
ফুটবে নয়া কলি।

নতুন ফুলের গন্ধ শুঁকে
সকাল হলে শেষ,
প্রজাপতির ডানায় চড়ে
যাব ছড়ার দেশ।

ছড়ার দেশে ফুলের ছড়া
ছড়িয়ে দেবো আজি,
সুবাস মাখা ফুলের ছড়া
পড়তে কারা রাজি?

বলল খোকা বলল খুকি
সবাই মাথা হেলে,
দাও তোমার ফুলের ছড়া
দিলাম পাতা মেলে।

হেমন্তের স্নিগ্ধ আমেজ

এইচ এম শাহেদুল ইসলাম তানভীর

হেমন্তের স্নিগ্ধ আমেজ
আর হিম-হিম স্বচ্ছ বাতাস,
শিশিরস্নাত প্রভাত দেয়
শীতের আগমন পূর্বাভাস।

নিরবে-নিঃশব্দে-আনমনে
হাঁটছি আমি পথে একা,
ভাবছি, ভাগ্য করে পেলাম
আবার হেমন্ত ঋতুর দেখা।

দিগন্তবিস্তৃত মাঠ জুড়ে নজর
কাড়ে সোনালি রঙের ধান।
বাহারি ফুলের ঘ্রাণে ফিরে
পায় সবাই নতুন করে প্রাণ।

ষড়ঋতুর মাঝে রূপমাধুরীতে,
নানা রঙা সাজে অনন্য,
পিঠাপুলির রূপ-রস-ঘ্রাণে
মৌ মৌ হয় উৎসব 'নবান্ন'।

তারা ভরা জ্যোৎস্নাস্নাত রাতে,
কুয়াশায় ভেজা ওই দুর্বাঘাসে;
দম্পতি যুগলপ্রেমের স্রোতে,
রবের লিলায় মিটিমিটি হাসে।

অনিন্দ্যকান্তি সৌন্দর্যের ডেরা,
ঋতুর রানি হেমন্তই যেন সেরা।

শীতের আগমন

রেজাউল করিম রোমেল

শীতের সকালে কুয়াশায় আচ্ছাদিত
প্রকৃতি,
সূর্যের দেখা নেই।
শিশির সিক্ত পথ ঘাট, গাছপালা,
হিমেল বাতাসে মিষ্টি মধুর আমেজ।
সবাই রৌদ্রের প্রত্যাশায়।
আবার অনেকে লেপের ভেতর শুয়ে
বিদায় জানায় শীতের সকাল।

বাড়িতে বাড়িতে আগুনের কুণ্ড
জ্বালিয়ে,
চারপাশে বসে শীত নিবারণের চেষ্টা
করে অনেকে।
শীতের পিঠায় কামড় দিতে দিতে
অথবা কোঁচড় ভরা মুড়ি আর
পাটালি গুড় নিয়ে রোদকে অভ্যর্থনা
জানায় পল্লী গ্রামে।

কৃষক সবজি বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত।
শিশুরা চাদর মুড়ি দিয়ে যায়,
মৌলবী সাহেবের কাছে কুরআন-হাদিস
শিখতে।
কুয়াশাকে ভেদ করে পাণ্ডুবর্ণ সূর্য যখন
তাল গাছের উপর উঁকি মারে,
তখন প্রকৃতিকে দারুণ উপভোগ্য মনে
হয়।

পত্র-পল্লবহীন গাছপালাকে মনে হয়
অলঙ্কার-শূন্য বিধবা।
নানা শাখ-সবজির সমারোহ,
পৌষ-পার্বণে পিঠা খাওয়ার মহোৎসব
চলে
সব জায়গায়।
নদীতে কমে যায় পানি,
জেলে ভাই মাছ ধরতে ব্যস্ত।

সামর্থবানদের শীতের আমেজের
বিপরীতে
অসহায় দরিদ্রদের জীবনে শীতের
কামড়
হয়ে ওঠে অসহ্য।
গাম্ভীর্যময় বৈশিষ্ট্যের জন্য
শীতকাল যেকোনো ঋতু থেকে স্বতন্ত্র।

কৃষানি

সাদিয়া সুলতানা

হতে চেয়েছিলাম কৃষানি;
মায়ের গর্ভে স্বপ্ন ছিল ভিন্ন,
ধরার আলো বাতাস পাওয়ার
পর মনে হলো কবি হই।
আকাশ, বাতাস প্রিয়তমা মাটিকে লিখি।

নাহারের মক্তব যাওয়া,
বই ও চক নিয়ে দৌড়াদৌড়ি
দেখার বয়স হলে মনে হলো তাকে লিখি।

ক্ষেতের আইলে হাজার বছর
ধরে রুয়ে দেওয়া বীজ ধান;
তেতুলের বীজ ভেদ করে
বেড়ে ওঠা দুটো পাতা,
দেখে মনে হলো তাকে লিখি।

মায়ের কোল ছুঁয়ে বেড়ে ওঠা শিশুকে,
দেখে মনে হলো মায়ের কোলের উপচে পড়া ওম লিখি।
গরুর বাছুরের ছোটাছুটি,
গাভির সাথে গলা মিলায়ে ডাকতে শেখা
শুনে মনে হলো তাকে লিখি।

শীতে ঝরে যাওয়া গাছের পাতা,
মুখ ভার করে থাকা ডালপালা,
সূর্যের উঁকিতে লুকিয়ে যাওয়া কুয়াশাকে
দেখে মনে হলো সব রেখে তাকে লিখি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শীতের চিঠি

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম

গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা গেল, গেল শরৎকাল,
হেমন্তে আজ শীতের শিশির ভেজায় ঘরের চাল!
এ যে হলো শীতের চিঠি, লেপ্টে থাকে ঘাসে,
ভোরের ঘাসে শিশিরকণা মিষ্টি রোদে হাসে।

শীতের চিঠি দিচ্ছে জানান আসছে দেশে শীত,
আর দেরি নয় এসেই দেখো শীত কাঁপাবে ভিত!
তোমরা সবাই তৈরি থেকো দারুণ মজা হবে!
শীতের পিঠা চিতই-পুলি নানান কিছু রবে।

জানো তো ভাই কেমন মজা মটরশুঁটির স্বাদ?
সবই হবে! সবই হবে! এলে শীতের রাত।
সবাই মিলে করব মজা আগুন জ্বেলে খড়ে,
লাগবে না শীত, মজাই মজা শীতটা এলেই পরে!

কবিতা/ছড়া

শীতের এত চাপ

শাজাহান কবীর শান্ত

একটু করে শীত
প্রকৃতি আর মানবকূলের নাড়াতে চায় ভিত।
নাড়াতে চায় বাঘের পুরু চামড়া এবং লোম,
শীত আমাদের বৃদ্ধ-শিশুর জন্য আরেক যম।

শীত, কুয়াশার জল-
শিশির বলে-'শীত হলো ভাই, আমাদের এক দল।'
দলের মাছি শীতের কণা ফোটায় গায়ে হুল,
কাঁপে পাখি, শীতের পোশাক যাদের অপ্রতুল।

শীতের এমন চাপ
হাতির শরীর-ঘোড়ার শরীর দিচ্ছে আড়ে লাফ।
লাফের চোটে বৃদ্ধ-যুবক হারাতে চায় হুঁশ,
মুমূর্ষু সেই মুহূর্তে তাও শীত দিতেছে পুশ।

শীতের নদী চুপ
কুয়াশাতে যায় না দেখা ঝকমকে তার রূপ।
রূপের দেখা পায় না গায়ক হারায় তাদের গান,
দিতেই আছে তাপমাত্রার নিচের দিকে টান।

আর কত রক্ত

বিশ্বজিৎ সমাদ্দার

এই রক্ত, ঝরছে কত! গ্রহের এই কাল দোষে।
মরছে কত! নিরহ মানুষ, অকালে! বিনা দোষে।
স্বপ্ন কত ভাঙছে দেখো, স্বজন হারিয়ে
মুক্তি কই, চুক্তি সব! রিক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে।

যুক্তি করে অন্ধ সাজো, মিথ্যাকে সত্য ভাবো,
মানতেও বাধ্য করো! আর বলো...কত বলি দেবো?
অন্যায়কারী বুক ফুলিয়ে, আছে ওদের শক্ত ঢাল।
স্বজন হারায় যে! সে... মুখ লুকিয়ে! এরা নিরবল।

আইন শুধু সাধারণের জন্য, ওরা আইনের ঊর্ধ্বে,
রক্ষক সেই তো...ভক্ষক, তুমি কবে উঠবে গর্জে?
যতদিন না নিজে পড়ছ ফাঁদে! চোখ বুজেই আছ।
ভুলে গেছ প্রতিবাদ? স্বার্থ নিয়েই বেঁচে আছ।

নিজের সম্মানে, নিজের অধিকারে, তুমি এখনও পরাধীন।
তোমার লড়াই! তোমায় লড়তে হবে, তুমি কি স্বাধীন?
সময় থাকতে ঘুমিয়ে আছ, ঘোর কাটবে কবে তোমার?
কতদিন আর হারাতে হবে, আপনজন! তোমার-আমার।

ভদ্র মানুষ আজ মুখোশ ধরে, নিয়েছে কসাইয়ের পেশা।
ভাবছ নাকি! বদলাবে ওরা, রক্তের যাদের নেশা?
রক্ত দিয়েছ, আরও নয় দেব! রক্তই ওদের ডুবাতে হবে।
রক্ত চোষার দল! রক্ত খেয়ে, ওদের মন শান্ত হবে।

কবিতা/ছড়া

একাত্তর

সোহাগ নূর

আমি দেখিনি একাত্তরের সংগ্রামী সেনারা
কেমন করে দেশের তরে করেছে লড়াই।
দেখিনিক কভু কত অনল পেলে
পুরো একটি গ্রাম পুড়ে হতে পারে ছাই।

আমি দেখিনি সেদিনের সেই নির্মম রজনি,
দেখিনিক কভু কতটা ব্যথিত হলে
লাশের পাশে অবুঝ শিশুর মতো কাঁদতে পারে স্বজনী।

আমি দেখিনি বোনের উপর আছড়ে পড়া
সে দিনের সেই নরপশুর কালো ছায়া,
দেখিনিক কভু সেদিনের বুলেটের আগাতে
রাস্তায় পড়ে থাকা আমার ভাইয়ের নিথর কায়া।

আমি দেখিনি কত সাহস পেলে
তাক করা কামানের মুখে
শির উঁচিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায়,
দেখিনিক কভু কতটা পাষাণ হলে
কাতার বেঁধে দাঁড় করিয়ে
চোখে চোখ রেখে গুলি ছোড়া যায়।

এদেশকে করতে মুক্ত, যারা দিয়েছে মান,
দিয়েছে যারা প্রাণ,
তাদের স্মৃতি হয়ে থাকুক চির অম্লান।
আমি আমৃত্যু গেয়ে যাব তাদের গান।

কুয়াশা ভেজা শীত

শাহজালাল সুজন

সাদা মেঘের ডানায় চড়ে
প্রকৃতিতে আসে ধেয়ে,
শীত ঋতুতে কাশবন ফুলে
প্রাণবন্ত হয় পরশ পেয়ে।

পৌষালি মন সিক্ত রোদে
কুহেলি রয় পথের বাঁকে,
উপন্যাসের পাতা জুড়ে
গল্পকথন ছবি আঁকে।

নদীর কূলে ছাউনি ফেলে
শীত কন্যারা বসত করে,
হিমালয়ের বরফচূড়া
শীতল মনে ঠান্ডা ছড়ে।

সূর্যের আলোয় সবুজ বনে
ছিটায় যেন মুক্তার দানা,
শর্ষে ফুলের হলুদ শাড়ি
বধূর উড়ছে আঁচলখানা।

রামধনুর সাত রঙের মেলায়
হারাই আমি অবুঝ মনে,
মাতাল হয়ে থাকি নেশায়
শীত অপরূপ প্রেমের সনে।

শরৎ এলে

বশির আহমদ লতিফী

বর্ষা শেষে সাদা কাশে
এলে শরৎকাল,
শরৎ এলে গাছে ফাঁকে
ভারি মজার তাল।

শরৎ এলে ফুল পাখিদের
আনন্দের নেই শেষ,
পিঠেপুলি বানান মায়ে
খেতে লাগে বেশ।

শরৎ এলে আকাশ জুড়ে
বসে মেঘের মেলা,
ফড়িং উড়ে ফিঙ্গে নাচে
রাখাল ছেলের খেলা।

ঋতুর রানি শরৎ এলে
কোকিল ডাকে গাছে,
এ ঋতুতে দুঃখী নয় কেউ
রাঙ্গা বুড়ির নাচে।

লাল-সবুজের ওই পতাকা

সুমাইয়া রহমান

শীতল হাওয়া বইছে কেমন
দিচ্ছে দারুণ দোল,
প্রভাতফেরির কণ্ঠ জুড়ে
চেতনার হিল্লোল।

ছবির মতো একটি দেশের
গল্প আছে কত,
আত্মত্যাগের গল্প আবার
বিজয়েরও শত।

লাল-সবুজের ওই পতাকা
দুলছে দারুণ বেশে,
হিমেল হাওয়া দিচ্ছে উঁকি
উঠছে কেবল হেসে।

রক্তস্নাত পথ পেরিয়ে
স্বপ্নভেজা ঘাসে,
বলতে পারো এমন বিজয়
কেমন করে আসে?

রক্তমাখা বছর শেষে
আসলো এক প্রভাত,
জাগলো বাংলা ছুটলো দামাল
রাখলো হাতে হাত।

বিজয় এলো একাত্তরে
চব্বিশেও ফের,
এই ভূমিটা হাতে গড়া
সোনার ছেলেদের।

শীতের ছড়া

আহাদ আলী মোল্লা

ঠান্ডা শীতল ঘোর কুয়াশায়
শীত পড়ে খুব তীব্র তো,
গরিব-দুখীর করুণ দশা
তারা ভীষণ বিব্রত।

এতিম অনাথ টোকাই শিশু
কাহিল জবুথবু,
তোমরা ধনী গরম কাপড়
দাও না কেন তবু!

ওরা শকুনের দল

ইবনুল হাফিজ তানভীর

লুটপাট করে খেলো শকুনের দল,
দেশটাকে করে গেল নিথর অচল;
মানুষে মানুষে বেঁধে দিয়ে কোন্দল,
পালিয়েছে সব শালা কুকুরের দল।

স্বপ্ন তো ভূরিভূরি দেখিয়েছে কাকা,
প্রকল্প নামে শুধু, কামে সবই ফাঁকা;
মিথ্যার ফাঁদে পড়ে অচল চাকা,
গরিবের পিঠে ছুরি মেরে নিলো টাকা।

চেতনা-চেতনা বলে 'স্বাধীনতা' খেলো,
স্বাধীন চেতনা আজ কোথায় গেল!
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসগুলো
গাদ্দারদের হাতে বিকৃত হলো!

কষ্ট তো হয় বুকে আফসোস হয়
অশ্রুতে দু'চোখের পাতা ভিজে যায়!
একাত্তরে কেন হলো সে লড়াই?
স্বাধীন চেতনা শুধু মুখে দেখা যায়!

কোনো শালা দেখাল না দেশের প্রতি,
প্রকৃত ভালোবাসা প্রেম বা প্রীতি!
ক্ষমতার দেখা পেয়ে ভুলে যায় নীতি,
দেখছি পঞ্চাশ বছরের এই রাজনীতি!

আজও যারা খেতে চায় লুটপাট করে,
ক্ষমতার কুৎসিত হাতটা নেড়ে।
দেখাতে চায় যারা অচাচিত বল,
মানুষ তো নয় ওরা শকুনের দল;
অমানুষ ওরা সব শকুনের দল।

তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ

কাব্যের রঙে বাংলার মানচিত্র

ইয়াকুব আলী তুহিন

বাংলা সাহিত্যের অমর কবি যারা,
শব্দের আকাশে তারার মতো জ্বলেন তারা।
রবীন্দ্রনাথের গান, নজরুলের বাণী,
জীবনানন্দের প্রকৃতি, মন কেড়ে নেয় জানি।

মাইকেল আনেন বিদ্রোহের রং,
সুকান্তের কলমে আগুনের ঢং।
জসীমের কবিতা গ্রাম বাংলার কথা,
আল মাহমুদের ছন্দে বয়ে যায় ব্যথা।

শামসুরের ভাষায় স্বাধীনতার ডাক,
রুদ্রের চেতনায় সত্যের ফাঁক।
ফররুখের কবিতায় ধর্মের আহ্বান,
নির্মলেন্দুর ছন্দে মানবের গান।

সুনীলের গল্পে প্রেমের সুর,
শক্তির শব্দে আকাশ ভরপুর।
অন্নদার কণ্ঠে সংগ্রামের ভাষা,
হাসানের কলমে স্বাধীনতার আশা।

কামিনীর অন্তর আনে শান্তির বারতা,
বেগম সুফিয়া নারী অধিকারের কথা।
নীরেন্দ্রনাথ, শহীদ কাদরীর কাব্য ধ্বনি,
হেলালের ছন্দে প্রেমের জ্যোতি।

তারা সবাই মিলে, এক সুরে গড়েন,
বাংলার কাব্য, যেথা তারা অমর থাকেন।
তোমাদেরই ছন্দে প্রাণ পায় এ ভাষা,
বাংলার কবিরা, তোমাদেরই ভালোবাসা।

কক্সবাজারে আমার হারানো সময়

আদিবা রায়হান

এক.

দুই হাজার চব্বিশের রক্তাক্ত জুলাইয়ের অভ্যুত্থান শেষে, আমাদের পরিবারের মনে হলো, একটু রিফ্রেশের জন্য দূরে কোথাও থেকে ঘুরে আসা দরকার। যে কথা সে-ই কাজ। প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে দুদিন পরেই বেরিয়ে পড়লাম কক্সবাজারের উদ্দেশে।

ভোরের বাতাসের স্নিগ্ধতা মাড়িয়ে গাড়ি চলছে হাইওয়ের ডান পাশের লেন ধরে। খুশি খুশি আমেজে গাড়ির ভেতর পরিবারের সবার খুনশুটি উপভোগ করতে করতে পৌঁছে গেলাম কুমিল্লার মিয়ামী হোটেলে। কিছু খাওয়া-দাওয়া

শেষ করে ফের গন্তব্যের উদ্দেশে রওয়ানা। এদিকে উর্দু নাত ছেড়েছেন বাবা, সবাই উপভোগ করছেন। নাত শুনতে শুনতে কখন যে, কাজিনের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম টেরই পেলাম না।

দিন শেষে রাত। চারিদিকে অন্ধকার। পাহাড়ি রাস্তার ভীষণ ভয়ংকর আঁকাবাঁকা পথগুলো ধরে এগিয়ে চলেছে আমাদের গাড়ি। কখনো রাস্তার পাশ দিয়ে গভীর খাদ, কখনো একের পর এক উঁচুনিচু বাঁক। ভয়ে গা ছমছম অনুভূতি। দুআ ইউনুস পড়ছি আর দুআ করছি, আল্লাহ নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দাও। পড়তে পড়তে কখন যে চোখ লেগে গেল বুঝতেই পারিনি। কাজিনের ডাকে বুঝতে পারলাম, সকাল হয়েছে, আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে গেছি। আলহামদুলিল্লাহ।

পুরো পরিবার এসেছি। দুটি গাড়িভরতি মানুষ। বাবা দুটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন। মাসকাট হলিডে হোটেলে। তাতে লাভ হলো কোথায়! ছয়টি রুম থাকা সত্ত্বেও আমাদের তিন কাজিনের ঘুমোতে হলো ড্রয়িং-রুমে। কী কপাল নিয়ে ঘুরতে এসেছি, ভেবেই একটু ঝগড়া করে নিলাম সবার সাথে।

সবাই নেতিয়ে যাওয়া শরীরটাকে একটু সতেজ করলাম। থাকব মাত্র চার দিন, একটা দিন গাড়িতে কাটিয়ে দিলে তো হবে না, তাই ফ্রেশ হয়ে সবাই হোটেলের কাছেই সুগন্ধা বিচে ছুটে গেলাম।

রাতের গভীর অন্ধকারে, যেখানে আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে গেছে, সেই রাতে কখনো সমুদ্রের ভাঙা ঢেউয়ের পানিতে হেঁটেছেন কি? পায়ের তলায় ঠান্ডা নরম বালু, আর উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ যেন এক অমোঘ টানে আমাকে ছড়িয়ে দেয় তার গভীরে। সমুদ্রের গর্জন ও একে একে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের আওয়াজ যেন পৃথিবীর সমস্ত রহস্য তার মাঝে লুকিয়ে রেখেছে। প্রতিটি ঢেউ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছিল, ঠিক যেন হাজারো সুরের নাচ! সেই ঢেউয়ের মুখে কুঁকড়ে থাকা শীতল জল আমার পায়ের পাতা ছুঁয়ে দিলো। যেন এক চিরন্তন ঐশ্বর্য নিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছিলাম। এই আশ্চর্য সুন্দর মুহূর্তে, মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সমস্ত সময় যেন থমকে গেছে।

সমুদ্রের সাথে এই সংলাপ, এই নিবিড় শান্তি, এই নৈঃশব্দ্য—সবকিছু যেন আমাকে এক নতুন জীবনের স্বাদ দিচ্ছিল। সুবহানাল্লাহ! এই তাজা, নির্মল ও প্রশান্ত পরিবেশে হারিয়ে গিয়েছিলাম। সময়ের হিসেব ভুলে গিয়ে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিস্ময়ে, এক অদ্ভুত প্রশান্তি নিয়ে সেদিনের মতো দ্রুতই হোটেলে ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পায়ে ব্যথার তীব্র যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙে গেল। শরীর কিছুটা অবসন্ন, তবুও আড়মোড়া ভেঙে উঠে বারান্দায় চলে এলাম। বাইরের মৃদু আলো যেন এক অদ্ভুত টানে আমার তনু-মনে ছুঁয়ে গেল। হালকা রোদ ঝলমলে আকাশের নিচে ছড়িয়ে পড়ছে, আর সেই রোদের মধ্য দিয়ে হিম শীতল বাতাস দেহে প্রবাহিত হচ্ছে। যেন সবকিছু এক অদ্ভুত সমন্বয়ে মিশে গিয়ে আমি নতুন এক জীবনে প্রবাহিত হচ্ছি।

এই শান্ত ও মিষ্টি আবহাওয়ার মধ্যে আমি চোখ বন্ধ করে খানিকটা সময় কাটালাম। আমার চারিপাশে এক নীরব শান্তি, এক অপূর্ব প্রশান্তি। মনে হচ্ছিল আমি সময়ের গণ্ডি ছেড়ে অন্য এক জগতে হারিয়ে যাচ্ছি। যেখানে শুধু আমি আর প্রকৃতি-অলৌকিক এক সমঝোতা।

দুই.

বড়োরা তাড়াহুড়ো করে রেডি হচ্ছিলেন বেরিয়ে পড়ার জন্য। তাগিদ দিচ্ছিলেন। হালকা নাশতা সেরে, সবাই একসাথে আবারও রওয়ানা হলাম। বিসমিল্লাহ।

পাহাড়ি ঝরনার অবর্ণনীয় সৌন্দর্য যেন আমাকে বিমোহিত করে রাখল। ঝরনার পানি ছিটকে পড়ার শব্দে মনে হচ্ছে—চারপাশের সবুজ প্রকৃতি যেন এক অজানা সুরে গান গাইছিল। আমরা ধীরে ধীরে সেই ঝরনার কাছে এগিয়ে চললাম। প্রকৃতির এই অপূর্ব দৃশ্য আরও কাছে গিয়ে উপভোগ করতে চেয়েছিলাম।

রাস্তার পাশে আরও একটি বিচ ছিল। সেখানে পৌঁছে একে একে আমরা মোটরবাইকে উঠলাম—যেন আরও এক দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে

পড়লাম। সেখান থেকে নেমে ঘোড়ায় সওয়ার হলাম। ঘোড়ায় বসে নিজেকে মনে হচ্ছিল, যুগ যুগ আগের কোনো কাফেলার হারিয়ে যাওয়া সওয়ারি। পথ খুঁজতে খুঁজতে যে মরুদেশ রেখে এই বাংলার জমিনে চলে এসেছে ভুল করে। ঘোড়ায় উঠলেই মনে পড়ে যায় আমাদের পূর্বের ইতিহাস। ঘোড়া নিয়ে কত ইতিহাস রচিত হয়েছে আমাদের ইসলামে। এই ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে কত বীর যোদ্ধা প্রাণ দিয়েছে, প্রাণ বাঁচিয়েছে কত মজলুম মা-বোনদের। এসব ভেবে আফসোস করছিলাম, আমি যদি হতে পারতাম সেই ঘোড়সওয়ার, যার এগিয়ে দেওয়া তির দিয়ে জালিমের বক্ষভেদ করেছেন আমাদের মুজাহিদ ভাইয়েরা।

তিন.

মাথার রোদ দেখে বুঝলাম দুপুর হয়েছে। পেটে খিদে। বড়োদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক হোটেলে গেলাম দুপুরের খাবারে। ফ্রেশ ও খাবার শেষে মিনি বান্দরবান ও ইনানী বিচ ঘুরে আমাদের নির্দিষ্ট হোটেলে চলে এলাম। বেশ ধকল গেছে বড়ো-ছোটো সবার উপর দিয়ে। তবুও ফ্রেশ হয়ে আমার দুই ভাইসহ আমরা খানিকটা আড্ডা দিই। সবাই ক্লান্ত দেখে আজ আর নিচে নামেনি। কেউ না। খাবার খেতেও না।

ক্লান্ত শরীর নিয়ে সবাই শুয়ে পড়ছে। যদিও আমার দু-চোখের ঘুম কোথায় যে উবে গেল—বুঝলাম না। কোথায় হারিয়ে গেলাম। জানালা খোলা। হয়তো জানালার ফাঁক থেকে বেরিয়ে সুগন্ধা বিচে চলে গেছে। কী আর করা, আমিও গুনগুন করে সুর তুলতে তুলতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

চার.

তৃতীয় দিন। ঘুরলাম অনেক। হিমছড়ি ও টেকনাফ লাবনী বিচসহ বিভিন্ন জায়গায়। একটু দূরে কিছু মানুষকে প্রাসিলিং করতে দেখে আমাদেরও খুব ইচ্ছে হলো। কিন্তু বড়োরা নারাজ। কোনোভাবেই মেয়েদের প্রাসিলিং করতে দেবে না। আমরাও খুব জেদ ধরলাম, অতঃপর আব্বুর মনটা নরম হলো। বললেন, ঠিক আছে, এসো। এত সহজে রাজি হয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি। প্রাসিলিংয়ের কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে ভাবছি, তখন না একটু জেদ ধরেছি—

তাই বলে রাজি হয়ে যেতে হবে বাবার! এখন তো উঠতেই হবে। মনে মনে নিজেকে বোঝালাম—'আমি এক স্বাধীন পাখি। ডানা মেলে যে উড়ে বেড়ায় আনমনে। কোনো বাধা কিংবা ভয় তাকে আটকে রাখতে পারে না।'

নিজের সাহসকে শক্তি করে আমি প্রাসিলিং শুরু করলাম, যেন সত্যিই এক স্বাধীন পাখি হয়ে উঠেছি। আর যখন প্রাসিলিং-এর সময় নিচে দেখছিলাম, তীব্র স্রোতের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমি যেন আকাশে ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছি, পৃথিবীর সব সীমাবদ্ধতাকে একপাশে ফেলে। আমার অন্য কাজিনরাও সাহসী হয়ে প্রাসিলিং করেছিল। সবাই একত্রে যেন আকাশ জয় করে নিয়েছিলাম, সেই মুহূর্তে পৃথিবীটা শুধুই আমাদের হয়ে উঠেছিল।

পাঁচ.

কক্সবাজার সফর আমার জন্য ছিল এক অসীম স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দের। প্রতিটি মুহূর্ত ছিল রোমাঞ্চকর, যেন প্রকৃতির মাঝে এক নতুন জীবন শুরু হয়েছিল। সমুদ্রের স্নিগ্ধ ঢেউ, পাহাড়ের শান্তি, ঝরনার সুর—সবকিছু এক অদ্ভুত মায়ায় জড়িয়ে ছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল আরও কয়েক দিন এখানে কাটাই—প্রকৃতির এই অপূর্ব সৌন্দর্য আর শান্তির মাঝে আরও কিছু সময় থাকতে। কিন্তু বড়োদের মন ছিল ফিরতি পথে। তাদের ইচ্ছে আমাদের ইচ্ছের সামনে বিজয়ী হয়ে গেল। বাধ্য সন্তানের মতো এক এক করে আমরা আমাদের ব্যাগ গুছিয়ে প্রস্তুত হলাম।

প্রকৃতির এই অবর্ণনীয় সৌন্দর্যকে বিদায় জানানো ছিল অতি কষ্টকর। প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি স্মৃতি যেন মনের এক অম্লান দাগ রেখে যায়। সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, যেন ফিরে আসা সম্ভব নয়। এক অদ্ভুত শূন্যতা তৈরি হচ্ছিল। সেই শীতল হাওয়া, ঢেউয়ের গর্জন ও আকাশের নীল—সবকিছু একে একে মনে উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এ যেন একটা স্বপ্ন, যাকে সবার অলক্ষ্যে শেষ হয়ে যেতে হয়।

প্রকৃতি সত্যিই আমাদের এক অনন্য রূপে সিক্ত করেছে। এখন সেই সৌন্দর্যকে বিদায় জানাতে হবে। কষ্ট হচ্ছিল, কারণ মনের ভেতর এক অদ্ভুত শূন্যতা তৈরি হচ্ছিল, যেন একটা অংশ আমাদেরই এখানে রয়ে গেল। আমরা বিদায় জানাচ্ছিলাম, কিন্তু প্রকৃতি যেন আমাদের হৃদয়ে চিরকাল অঙ্কিত হয়ে রইল। সৃষ্টির এক অপরূপ মায়ায় আটকে থাকার মতো অনুভূতি ছিল।

যখন গাড়ি চলতে শুরু করল। কক্সবাজারের সেই শেষ দৃশ্যটা একে একে চোখের সামনে চলে এলো, আর মনে মনে বললাম—'তুমি আজকের মতো বিদায়, হয়তো একদিন আবার ফিরে আসব, ইনশাআল্লাহ।'

শিক্ষার্থী ও লেখিকা

অভিযোগে বিয়োগের দাগ

মাহদী গালীব

ঢাকা থেকে চাচ্চু (মুফতি বাকি বিল্লাহ হাফিজাহুল্লাহ) আব্বুকে ফোন করেছেন। ফোন আলাপে সিদ্ধান্ত হয়েছে—আগামীকালই যেন আমাকে ঢাকা পাঠানো হয়। তিনি আমার জন্য তারাবি ঠিক করেছেন। যেই কথা সেই কাজ। কালবিলম্ব না করে আব্বু ট্রেনের টিকিট জোগাড় করলেন। ফলত টিকিট নিয়ে সামান্যও মাথা ঘামাতে হলো না।

পরদিন প্রত্যুষে আব্বু আমাকে নিয়ে বিদ্যাগঞ্জ স্টেশনে এলেন। ট্রেন আসতে এখনও অনেক সময় বাকি। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। যাই হোক, সেই ফাঁকে টং দোকানে বসে ধোঁয়া ওঠা এক কাপ চা আর রুটি দিয়ে প্রাতঃনাস্তা সেড়ে নিলাম। আব্বু কেক, রুটি ও হাবিজাবির প্যাকেট ছিঁড়ে আলগোছে ব্যাগে পুরে দিলেন। আমার শত মানাকে কর্ণপাত না করে ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি এঁকে বললেন—অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে, ক্ষুধা লেগে যাবে; তখন খেয়ে নিয়ো। আব্বুর থেকে এমন সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার নতুন কিছু নয়। তবুও বরাবরের মতো

কৃতজ্ঞতার সুরে বললাম—জাযাকাল্লাহ খায়রান।

এদিকে অনিয়ম ট্রেন নিয়ম মেনে ঠিক সময়ে পোঁ পোঁ সাইরেন বাজিয়ে স্টেশনে ভিড়ল। অনেক মানুষের সমাগম। লোকে লোকারণ্য। পুরো স্টেশনজুড়ে ভিড়ভাট্টা বেশ। আব্বু ব্যাগ কাঁধে নিয়ে আমার হাত ধরে ভিড় চিরে ঢুকে পড়লেন। সিটে বসিয়ে নেমে গেলেন তিনি। দূর থেকে জানালেন বিদায়ের বাণী।

ট্রেন চলতে শুরু করল তার আপন গতিতে। শাঁ শাঁ আওয়াজ। আমি জানালায় উঁকি দিয়ে আব্বুকে দেখতে লাগলাম। আব্বুর চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু ঝরছে। আমি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। কপোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা। ক্ষাণিকবাদে বিড়বিড়িয়ে তিলাওয়াত শুরু করলাম। বাইরে ভীষণরকম সুন্দর পরিবেশ। দেখে পুলক অনুভব করলাম। মুগ্ধতার কাছে সমূহ দুঃখ বেচে দিলাম চড়া দামে। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে 'ঝিকঝিক' করে ট্রেন কমলাপুর স্টেশনে গা ঘেঁষল। এতক্ষণে বেলায় লাল ধরেছে। টুকটুকে লাল।

ফলত একটা ছাউনির নিচে বসলাম। ক্ষুধাতুর শরীর আর সায় দিচ্ছে না। তখন চোখ পড়ল ব্যাগের উপর। ব্যাগ খুলতে আব্বুর কথা মনস্পটে ভেসে উঠল। মনের পেলব অনুভব হলো। কেক রুটি বের করে মুখে পুরে নিলাম। ক্লান্তি কিছুটা শান্তিতে বদলে গেল। অকস্মাৎ চোখ পড়ল মধ্যবয়সি এক যুবকের উপর। আমার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল সে। আমি তাকে দেখে হতচকিয়ে উঠলাম। কারণ তার হাঁটার সুরটা একেবারেই ভিন্নরকম ছিল। (আল্লাহ মাফ করুন) তার পিঠ উটের কুঁজের মতো বেশ উঁচু। ফলত স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াতে অক্ষম। দুই হাত সামনে ফেলে পা দুটো হিঁচড়ে যাচ্ছিল। আচমকা আমার হৃদয় মুছে উঠল তা দেখে। হৃদয়ের মণিকোঠায় রক্তক্ষরণ হলো বেশ। সকল খুশির বাঁধ নিমিষেই ভেঙে গেল। অবসান ঘটল সকল অভিযোগের।

অভিযোগের পাতায় বিয়োগের দাগ টেনে রব্বে কাবার দরবারে কৃতজ্ঞতায় মাথা নুইয়ে সেজদায় পড়লাম। ভাবতে লাগলাম আমরা কত নাফরমান আর আল্লাহ কত মেহেরবান। অযাচিত নেয়ামতরাজিতে ডুবিয়ে রাখেন হরদম। অথচ আমরা কৃতঘ্ন। আমাদের অভিযোগের খাতায় যোগ চিহ্নের অভাব নেই। পরিসমাপ্তিতে বলি, অভিযোগের খাতায় বিয়োগের দাগ চিরে ফিরে এসো সবাই শান্তির নীড়ে।

শিক্ষার্থী, মাদরাসা মারকাজুল হিদায়া ঢাকা

কুয়াশামাখা সকালে

সাজিদ বিন আওলাদ

কিছুদিন যাবৎ প্রচণ্ড শীত পড়ছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে কুয়াশা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। চারিদিকে সাদা ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে আছে। যেন কেউ সাদা রঙের আবির ছড়িয়ে দিয়েছে চারপাশে। সাথে শিশির ফোঁটাগুলো টপটপ করে ঝরে পড়ছে গাছের পাতা থেকে রাস্তায় কিংবা পথচারীদের মাথার উপর।

শীতের সকালে বাজারে কিংবা রাস্তার পাশে দেখতে পাওয়া যায় খেজুরের রস। গাছিরা মাথা থেকে রসের হাঁড়িটা নামানোর সাথে সাথেই ক্রেতারা রস খাওয়ার জন্য ভিড় জমিয়ে ফেলে। মুহূর্তেই রসের হাঁড়ি খালি। মানুষের মুখে গুঞ্জন শোনা যায় যে, এই রসের সাথে পানি মিশিয়ে বিক্রি করা হয়। এ বিষয়ে সত্য-মিথ্যা তো আর আমরা জানি না। তারপরও কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করলাম—একদম নির্ভেজাল খেজুরের রস খাব। যে জায়গা থেকে খেজুরের রস কাটা হয়, সেখানে গিয়েই খাব।

খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, আমাদের মাদরাসা থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে চৌহাট নামক এক গ্রামে খেজুরের রস

পাওয়া যায়। বন্ধুরা মিলে যাওয়ার জন্য শুক্রবার দিন ঠিক করলাম। কিন্তু সমস্যা বাঁধল যখন জানতে পারলাম—ফজরের নামাজের আগে না গেলে রস পাওয়া যাবে না। গাছওয়ালা ভোরবেলা গাছ থেকে রস পাড়ার আগে থেকেই মানুষ অপেক্ষায় থাকে রস কিনে নেওয়ার জন্য। এই কথা শোনার পর থেকেই সবার কপালে চিন্তার একটা রেখা পড়ল। কারণ, এতদূরে তো মাদরাসা থেকে গভীর রাতে যাওয়া যাবে না। তারপরও সবাই মিলে ঠিক করলাম রস খেতে আমাদের যেতেই হবে। আমরা ছিলাম আটজন। যানবাহন হচ্ছে মোটরসাইকেল। মোটরসাইকেলগুলো রাখা হয় মাদরাসার মাতবাখে। রাতের বেলা হুজুরের কাছে ছুটি চাইতে যাই। আমাদের নেগরান মাওলানা সুহাইল সাহেবের কাছে। হুজুরের কাছে যেতেই স্নিগ্ধ একটা হাসি দিয়ে আমাদের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করেন। আমরা হুজুরের কাছে আমাদের ইচ্ছার কথা জানাই। হুজুর বলেন, তোমরা এত রাতে যাবে, যদি তোমাদের কোনো বিপদ হয়? আমরা হুজুরকে জানাই—আমরা যথাসম্ভব শৃঙ্খলা মেনেই যাব। তারপরও হুজুর দ্বিমত করেন। দ্বিমত করাটাই স্বাভাবিক। কেননা আমরা হলাম হুজুরদের কাছে আমানত। যদি আমাদের কিছু হয়ে যায়! আমরা অনেক আবদার করে শেষ-মেশ হুজুরের কাছ থেকে অনুমতি পাই।

হুজুরের রুম থেকে বের হয়ে খুশিতে একেকজন আনন্দে আত্মহারা। আমাদের খুশি আর দেখে কে! রওয়ানা দেওয়ার সময় রাত তিনটা নির্ধারণ করে সবাই ঘুমিয়ে পড়ি। আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে সাজ্জাদ আর সাব্বির। সবাই অজু করে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করে রাস্তায় বের হই। দুই মোটরসাইকেলে তিনজন করে ছয়জন আর সাজ্জাদের মোটরসাইকেলে আমি আর সাজ্জাদ। সাজ্জাদ ছিল চালক আর আমি যাত্রী। শীতের রাত তার উপর কুয়াশা আর মোটরসাইকেলের বাতাস। ভেতরের সবকিছুকে একদম নিস্তেজ করে দিচ্ছে। পায়ে মোজা না থাকায় বাতাসে পা একদম হিমশীতল হয়ে গেছে। জ্যাকেট ও রুমালেও শীত মানছে না।

সাজ্জাদ আমাকে বলে বাতাসে না-কি তার চশমার কাচ ঘোলা হয়ে গেছে। সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না ঠিকমতো। কিন্তু তারপরও সাজ্জাদ দমে যাওয়ার পাত্র নয়। সবাইকে পেছনে রেখে একাই দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। ভোররাতে মেন রোডে সাধারণত তেমন গাড়ি থাকে না। আমি পেছনে বসে রাস্তার পাশের বাড়িঘর, অন্ধকার গাছপালা ও বাজারের দোকানগুলো দেখতে থাকি। দোকানের লাইটের নিচে ক্ষীণ আলোয় কুকুরগুলো দলবেঁধে ঘুমিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর মেইন রোড ছেড়ে গ্রামের রাস্তায় প্রবেশ করি। কিছুদূর যাওয়ার পর আমাদের পেছনে দেখি

মোটরসাইকেলের বহর আসতেছে। আমরা বুঝে গেলাম যে, তারাও রস খেতে যাচ্ছে। সাজ্জাদ তাদের সাথেও মোটরসাইকেল নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়, তাদের কাউকে আগে যেতে দেওয়া যাবে না।

অল্প কিছুক্ষণ চলার পর আমাদের সামনের দুই মোটরসাইকেল থেমে যায়। সাজ্জাদও তারটা থামিয়ে দেয়। সবাই নেমে পড়ি। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি ভোর সাড়ে চারটা। এখনও গাছওয়ালা রস কাটতে আসেনি। আমাদের আগে থেকেই অনেকে অপেক্ষা করছে। তারাও গাছের নিচে এই প্রচণ্ড শীতের মাঝে অপেক্ষা করছে। আমাদের মাঝ থেকে রিয়াজুল আগেও একবার এখানে রস খেতে এসেছিল, তাই ও গাছওয়ালার বাড়ি চিনে। রিয়াজুল আর মারুফ মিলে যায় গাছওয়ালাকে ডাকতে আর আমরা বাকিরা তাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। অপেক্ষা যেন শেষ হওয়ার নয়। অল্প একটু সময়কে আমাদের কাছে বহুকাল মনে হতে থাকে।

অবশেষে রিয়াজুল গাছওয়ালাকে ডেকে নিয়ে আসে। আমরা তাকে সালাম দিই। তিনি হাসিমুখে সালামের উত্তর নেন। জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় থেকে এসেছি আমরা? বলি ইসলামপুর মাদরাসা থেকে। তিনি অবাক হয়ে বলেন এত দূর থেকে আপনারা রস খেতে এসেছেন। মুখে হাসি টেনে বলি, হুম অনেক দূর থেকেই। একদম খাঁটি খেজুরের রস খাওয়ার জন্য। কপালে তার ছোটো টর্চ লাইট লাগানো। সেটার সাহায্যেই অন্ধকারের মাঝেও গাছে উঠে পড়লেন। রস নিয়ে গাছ থেকে নামতে নামতে ফজরের আজান হয়ে গেছে। গাছওয়ালা হাঁড়ি থেকে মেপে আমাদের রস খেতে দেয় গ্লাসে করে। প্রতি কেজি ষাট টাকা। সবাই প্রাণভরে রস খেয়ে নিই । উদরপূর্তি করে বাড়ির জন্যও নিতে ভুলিনি। অতঃপর ফজর নামাজ পড়ে সবাই মসজিদে মোটরসাইকেল রেখে গ্রাম দেখতে বের হই।

কাঁচা রাস্তা ইট দিয়ে বাঁধাই করা। রাস্তার পাশে সারি সারি খেজুরের গাছ আর প্রতিটি গাছেই হাঁড়ি ঝোলানো। খুবই মনোমুগ্ধকর একটা দৃশ্য। পাখিরা মাত্র নীড় থেকে বের হয়েছে খাবারের সন্ধানে। তাদের কিচির-মিচির রব কুয়াশা ঢাকা পরিবেশটাকে মুখরিত করে তুলেছে। অল্পকিছু সময় ঘোরাফেরা করে সবাই রওয়ান দিলাম বাড়ির উদ্দেশ্য, বিকেলে আবার বাড়ি থেকে মাদরাসায় যেতে হবে। কিন্তু স্মৃতির পাতায় আজকের দিনটা আজীবন স্মৃতিময় হয়ে থাকবে।

শিক্ষার্থী : জামিয়াতুল উস্তায শহিদুল্লাহ ফযলুল বারী (রহি)

পাহাড়ের প্রেমে একদিন

ইবনুস সা'ঈদ

আমি আরও আশ্চর্য হলাম। কৌতূহল দমন করতে না পেরে গাড়ির ঝরঝরানির সঙ্গে গলা মিশিয়ে আসিফকে শুধালাম— 'তবে কি সত্যিই সেখানে পাহাড় আছে? সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকু পাহাড়ের পাদদেশে বসে দেখার আশ আমার অনেক দিনের!' তখন নদীর জলের মতন সহজ শব্দে বুনা আমার এই বাক্যের সরল সমীরণে সাথি-সঙ্গী সবাই এমন হাসির মেলা জন্মায়, যা আমার পক্ষে উপহাসস্বরূপ ছিল; কারণেই ভেতরের সবটুকু নির্যাস উপচে পড়া বর্ষার মতো ফেনিয়া ওঠে রাগ রঙ্গিমায়।

আসলে সেদিন আমাদের ভ্রমণ ছিল লোকসংস্কৃতির শহর নেত্রকোনার কলমাকান্দা থানাধীন পাঁচগাঁও। প্রকৃতির সবুজ আবরণ খসে পড়ার শীত সবেমাত্র অদৃশ্য হলো। বসন্তের প্রথম কোকিল গলাটা ঠিকমতো খুলছে না, ভাঙা গলা। সদ্য তরুণ কবির মতো, কুহু উচ্চারণ করতে গিয়ে নানা বিকৃতি শব্দে ছড়িয়ে

পড়ছে তরুণ কোকিলের বসন্তের আবহ। বসন্তের এই প্রথম সময়টাতে আমরা হুটহাট বেরুলাম পর্বতের সুপ্ত প্রেমের টানে। আমাদের বেশ ক'জনের মধ্যে আমার সঙ্গী আসিফ। বাইকের হাতার উপর দুই হাত বদ্ধ করে আসিফ যেন সকলের নিকট হতে পৃথক হয়ে চলছিল, কারোর সঙ্গে যেন তার কিছুমাত্র গা-ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না, এটাই সর্বাপেক্ষা বেশি করে আমার চোখে ঠেকেছিল। তার যে কেবল বুদ্ধিশালী মননশীল গাম্ভীর্যের ভাব তা নয়, তার ললাটে যেন একটা অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল—যা তাকে সকলের হতে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল। তবে যে ব্যাপারটি আমাকে অত্যন্তই খাপছাড়া করে তুলেছিল, তা আসিফের বেশ ধীরেমন্থরে চলন। অথচ আসিফ তো নিতান্তই অর্বাচীন নয়।

বস্তুত আসিফ কবি। তার কবিতায় বস্তু যেটুকু, ভাবুকতা তার চেয়ে বেশি। বেশভূষা, ব্যবহারেও সেই স্ফুটতার একটা পরিচয় ছিল, হালকা বড়ো চুল এবং কবিতাতেও ভাবুকতার তুরীয় রকমের একটা শৌখিনতা প্রকাশ পেত। আর এইটাকেই সুবর্ণ সুযোগ বলে মনে করে শূন্যে ভাসালাম বাক্যের সরল সমীরণ—'আসিফের পুরো সত্তা যেন আষাঢ় মাসে বর্ষার মতো মন্থরতায় ভরা।' এইটুকুন বলে কোনোরূপে ফাঁড়া কাটাতে পারলাম।

এইবার আসিফের খড়্গনাসায়, তার চাপা ঠোঁটে, তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ফুটে ওঠে। গৌরকান্তি দীর্ঘকায় আসিফের মুখের মধ্যে এমন একটি দৃপ্ত তেজ ঝলসে ওঠে—যা তাকে সবার আগে মফস্বল থেকে শহরে পৌঁছতে সান্দ্র ভূমিকা রাখে।

নেত্রকোনা শহরের কোনো এক চায়ের দোকানের খুঁটিতে পিঠ লাগিয়ে ধূমায়িত লিকারের চায়ে প্রসন্ন মনে চুমুক দিচ্ছি আর বাদবাকি সবার জন্যে প্রতীক্ষার প্রহর গুনছি। অদৃশ্য হাওয়া শীতের ঝরে পড়া হলুদা পাতাদের দৌড়ঝাঁপ এইখানটাই তেমন নেই। নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বৃক্ষরাজির ডগায় ডগায় নতুন পত্র-পল্লবের কুঁড়ি মেলে ওঠা শুরু করেছে। অমনি দেখি, আসিফ অভিনব এক উচ্চারণে নতুন পত্র-পল্লবে প্রেম রোমন্থন করছে। তার কোনো উচ্চারণই আমার কাছে বিষাদ ঠেকেনি। পরক্ষণেই বাকি সবাই উপস্থিত হয়। কালবিলম্ব না করে মহাসড়ক বাদে মফস্বলের আঁকাবাঁকা চিকন পথে সবাই রওনা হই।

আসিফ তখন মোড় নিতে ব্যস্ত। আমি বললাম—'মহাসড়কেই তো সব থেকে আরামদায়ক হতো, গাড়ি আবার মোড় নিচ্ছে কেন?'

—'সেই ভালো, ঠাকুরকোনা পর্যন্ত যখন মহাসড়ক ভাঙা, তখন মেহগনির বাগান দেখেই চলামাক।'

দূরে থেকেই সারি সারি মেহগনি গাছ চোখে পড়ল। চিনারের চেয়ে কম নয়—সোজা আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। কোমর অবধি

ডালপালা নেই, বাকিটুকু মসৃণ ঘনপল্লবে আন্দোলিত। মনে হলো—এই যেন চিনার গাছ! সারি বাঁধানো রমনীয় চিনার বাগান! আদিগন্ত বিস্তৃতি ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে আমরা পিচঢালা চিকন পথে চলছি। পথের দুপার্শ্বে সারিবাঁধানো মেহগনি গাছ। মৃদুমন্দ বাতাসে মেহগনি যখন তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধীরে মন্থরে আন্দোলিত করে, তখন শ্যামলিমাহীন সুপারির মতো সমস্ত ক্ষণ ভয় হয় না—এই বুঝি ভেঙে পড়ল! ফলে ক্লান্ত পথিকের অবসাদগ্রস্ত দেহ তলায় বিছিয়ে দিতে পারে নির্দ্বিধায়। দূরে থেকে আরও চোখে পড়ছে সবুজের কোমলে বিদ্যুৎ-ছড়ানো বিচিত্র বনোফুল আর মগডালে হরেকরকম পাখি যেন কবিতার মতো কথা কয়। আচ্ছা, ইরানি কবিরা তো উচ্ছ্বসিত হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তন্বঙ্গী তরুণীর রূপরঙ্গিমা রাগরঙ্গিমার সঙ্গে চিনারে দেহসৌষ্ঠবের তুলনা করে যখনো তৃপ্ত হননি। তবে আমি এই সারি সারি মেহগনির দেহসৌষ্ঠবকে কীরূপে কিমের সঙ্গে তুলনা করব?

এই প্রেমোদগম দৃশ্য আমাদের আটকাতে পারেনি। কারণ আমাদের মন, মনন ও কল্পনাকে তো প্রাণাভিরাম ওই পর্বতের মর্মর টেনে নিয়েছে। তবে সত্যিকারার্থে যেকোনো প্রেমিকের কাছে এই দৃশ্য গোপন প্রেমের মতোই আকর্ষণীয় মনে হবে। অতঃপর সূর্যের বাড়ন্ত তেজে আমি প্রেমোচ্ছ্বাসগীত গাইতে গাইতে প্রেমোদ্দামসব দৃশ্যকে পেছনে ফেলে আমরা ঠাকুরকোণা এসে পৌঁছলাম। আমরা হালকা কিছুটা ক্লান্ত-শ্রান্ত। অবসাদগ্রস্ত দেহে যাত্রাবিরতি দিয়েছি। ঠাঁই নিয়েছি সাকিব ও মেহেদি ভাইয়ের এক বন্ধুর দোকানের চেয়ারে চেয়ারে। বড়ো ভাইদ্বয়ের সেই বন্ধু মানুষটির ঠান্ডা লেবুর শরবতসহ হালকা আতিথেয়তায় আমাদের শরীরের শক্তিমত্তা ফিরে আসে। তবে আমাদের ভয়টা সূর্যের প্রতি। যদি সবটুকু তেজ মেলে ধরে, তাহলে পথ অতিক্রম করা তো বড়োই মুশকিল হবে। কিন্তু কথায় আছে না-যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়। সূর্যের রাগ রঙ্গিমা যেন আজ প্রখর আকার ধারণ করেছে। চোখ ঝলসানো আলোয় যেন উপরে তাকাতে বারণ। সে যা-ই হোক, আমরা পর্বতের প্রেমের নেশায় এসব ভ্যাপসা গরম আর সূর্যের রাগ রঙ্গিমা উপেক্ষা করে ছুটে চললাম মহাসড়কে। আমাদের আগামী মানজিল কলমাকান্দা শহর। তারপর সেখান থেকে সোজা পাঁচগাঁও পাহাড়।

বাইক ঝড়ের গতিতে চলছে। সবাই আমাদের পেছনে পড়েছে। আমাদের ডানে-বামে আদিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানক্ষেত। শিষ এখনও ফুটে ওঠেনি। হয়তো-বা অতি সত্বর ফুটে উঠবে। আসিফ বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, এ জীবনে মনে রাখার মতো যা কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে, এই ভ্রমণ হবে তাঁর একটি।'

আমি বললাম, 'আমারও তা-ই ধারণা।'

আমি তাকানো তখন ধানের সবুজ দৃশ্যপটে। ধানগুলোরই-বা কী শোভা!

মাথায় মাকরসার মায়াজাল। সূর্যের আলোয় ব্যাপারটি যেন বেশ রোমন্থন ও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। হঠাৎ হালকা বড়োসড়ো একটি নদী সামনে পড়ে। কী স্বচ্ছ তার পানি! ঘন নীল আকাশের ছায়া পড়ছে তার গায়ে। সবুজের বুক চিরে নদী চলছে আপন গতিতে। আমার কেবলই মনে হতে লাগল—ইস, যদি ওই পানি ছুঁয়ে দেখতে পারতাম!

মাঝে মাঝে সড়কের পাশে বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। একটা লালরঙা ইটের বাড়ি দেখলাম। ছবির বাড়িও এত সুন্দর থাকে না! বসন্ত সমীরণ ওই বাড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। বাড়ির উঠোনে সাদা রঙের শুভ একটা ঘোড়া। কালো নিকাব মাথায় জড়িয়ে বাচ্ছা একটা মেয়ে দৌড়াচ্ছে। আহা! কী সুখেই না আছে! বাড়ি পার হয়ে বাইক চলে এলো ফুলে ফুলে ভরা এক খোলা প্রান্তরে। এইখানটায় পথের পাশে কোনো বাড়ি পড়ছে না, কেবল সবুজের কোমলে বিদ্যুৎ-ছড়ানো বিচিত্র ফুল। খুব পরিচিত ফুল-কাশফুল। চেনা ফুল অচেনা জায়গায়। কিছু অচেনা বনোফুলও আছে। ফুটে আছে পথের ধারে ধারে পাতার ফাঁকে শূভ্র-সাদাফুল। রঙে রং মেশানো বিচিত্র সব পাতাবাহার। কী ভালোই না লাগছে দেখতে!

আমরা চলছি প্রসন্ন হৃদয়ে। ঝাপসা দেখা যাচ্ছে ইট-পাথরের দালান। অল্পক্ষণেই পৌঁছলাম নদী পার হয়ে শহরে। শহরের ভেতর নদীর ব্যাপারটি খুবই স্পর্শকাতর। আগেকার যুগে পথঘাট না থাকায় বাণিজ্যিক আনাগোনা কেবল নদীর স্রোতে হওয়াই প্রতিটি শহর গড়ে উঠেছে নদীর তীরে। ময়মনসিংহের অদূরেই এই কলমাকান্দা শহর। যেন পড়ে আছে ভারতবর্ষ ও বঙ্গভূমির এক প্রান্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুর্নিরীক্ষ্য এক বিন্দু, কাচারি আদালত থানা পুলিশ জেলখানা নিয়ে বিশাল প্রশাসন-যন্ত্রের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অক অংশমাত্র। এখানে শিক্ষিতরা সকলেই প্রায় সরকারি চাকুরে বা শহরে আসে মামলার দায়ে কিংবা উকিল মোকার স্কুল মাস্টার অন্যেরা দোকান চালাম বা শহরে আসে বেচাকেনা করতে। বিরাট স্তূপে পড়ে আছে রাশি রাশি কী একান জিনিস-শুকনো বিবর্ণ ও আকৃতিহীন—আমি ভেবেছিলাম, জ্বালানি-কাঠ হবে বুঝি, পরে শুনলাম সেগুলোই শুঁটকি মাছ।

আমরা কলেজের গেইটে এসে দাঁড়ালাম, অল্পক্ষণ পর সবাই জমা হলো। সাব্বির কলেজের ভবনগুলোর দিকে হাত উঁচিয়ে তখন বলে—‘এইখানেতেই পড়ে আছে আমার কাকুর প্রিয়জনের হাজারো স্মৃতির অমলিন সম্ভার।’

এবার কলমাকান্দা শহর থেকে আমরা চলছি পাঁচগাঁওয়ের পথে। আমার গলায় অজস্র খুশি। আপ্লুত স্বরে কথা বলতে গিয়ে, বাতাসে তিরছির নাচা খুর্মা পাতার মতো গলার আওয়াজ কাঁপছিল অনবরত। আমার আস্ত হৃদয়টা চলে গেছে বহু অগ্রসরণে। ভোরের টাটকা আনন্দ উপচে

পড়ছে আমার মুখে। আত্মার সব আনন্দ কাঁপতে কাঁপতে কুলোয় টক্কর খাওয়া চালের মতো গলায় যেন জড় হচ্ছে। বেজায় বিমলানন্দে দু'হাত বাতাসে ছাড়িয়ে আসিফকে শুধালাম—'আর কতদূর আসিফ?' আসিফ বলল—'অতি সত্বর আমরা পৌঁছুব।'

অল্পতে খুশি হওয়া মানুষ আমি। বেলফুলের কুড়ির মতো একটা অনুচ্চ শুভ্রতা ছড়িয়ে গেল মুখে। আমার ব্যাকুল হৃদয় খুশিতে টানটান। তাই আসিফের স্বল্প কথায় মরুর শুকনো বাতাস বৃষ্টির গন্ধে ভিজে ওঠার মতো একটা স্বস্তি আমার অন্তর ছুঁয়ে যায়।

এইবার আমাদের বাইক ঢুকল প্রাণাভিরাম এক পথে। দু'ধারে ঘন বাঁশবাগান। মনে হচ্ছে বাইক গভীর জঙ্গলের পার্শ্ব কাটিয়ে যাচ্ছে। বাঁশপাতার তিরতিরে নাচন-ধ্বনি, কোমর দুলিয়ে বাঁশদের মৃত্যুমুখর দৃশ্য আমায় আন্দোলিত করে। প্রকৃতির সবুজ এসে আমার চোখে পড়ে এবং চোখের মণিতে সবুজ ভেসে ওঠে। পথে পথে মোহনসব দৃশ্যের মুখোমুখি হচ্ছি। নিদারুণ এক ভালো লাগায় ভেতরটা জেগে উঠেছে। প্রণয়ের সবটুকু নির্যাস উপচে পড়ছে বাইরের শূন্যতায়। একটা লাল-কৃষ্ণচূড়ার বিশালাকার বৃক্ষ দেখতে পেলাম। সদ্য তরুণ যুবকের মতো বাড়ন্ত দেহে বিশাল জায়গা জড়িয়ে নিয়েছে। মুড়ি-চিরার মতো ছোট্ট পাতারা তলায় পড়ে বাতাসে উড়োউড়ি করছে। চড়ুইয়ের সদ্য তরুণীরা খেলছে যেন। কৃষ্ণচূড়ার তলায় একটি লেক। কী স্বচ্ছ তার পানি! লেকের পাড়ে রঙিন একটি আসন পাতানো। প্রিয়তম কৃষ্ণচূড়া হাতে বসে আছে, উপচে পড়া ভালোবাসায় প্রিয়তমার মাথায় গুঁজে দেবে বলে!

শিহরিত ভাবনায় ভোরের মেদুর হাওয়ার মতো আরেকটু এগিয়ে গেলাম। এইবার গাছের ফাঁকে ফাঁকে স্পষ্ট ভেসে উঠছে পাহাড় এবং পাহাড়ে ঘন সবুজের সমারোহ। হালকা দূরে থেকে পাহাড় এত চমৎকার মোহনীয় হয়! সাথি-সঙ্গী সবাই একসাথে আশপাশ কাঁপিয়ে চিল্লায়া উঠে। 'আমরা এসে পড়েছি'—এমন বহুবাক্যে সবাই যেন পুলকিত প্রকম্পিত উদ্বেলিত। সামনে বসে আসিফ বলে ওঠে, 'পাহাড়ের সঙ্গে এইবার হবে সুপ্ত আলিঙ্গন।' আমার নয়নমুদিত ভাবনার আকাশে নক্ষত্রের মতোই ফুটে ওঠে গোপন প্রেমের মতোই আকর্ষণীয় আসিফের এই ছোটবাক্য। সকালের আলো পেয়ে সূর্যমুখী যেমন ফোটে, আকাশ-জোড়া ঝিমঝিম জ্যোৎস্নায় যেমন কামীনির সুঘ্রাণ ফোটে, তেমনিভাবে আমার চোখে-মুখে পাহাড়ের প্রেম শতদল পদ্মের মতোই ফুটে ওঠে। যেন আমার দেহ-মন-আত্মা পর্বত প্রেমের জ্যোৎস্না স্নাত হয়ে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে।

আমরা উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে দাঁড়ানো পাহাড়ের সামনে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তঘেঁষা সারি সারি সবুজ পাহাড় আর তার উপর সাদা-কালো মেঘেদের লুকোচুরি খেলা আমাদের তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। দাঁড়িয়ে

থাকা সম্ভব হলো না আর। মেঘ ছোঁয়ার অদম্য নেশায় ছুটতে লাগলাম দিগন্ত পালে। খাড়া পাহাড় বেয়ে সবুজে ঢাকা রৌদ্রময় পারবেশে শুরু হলো আমাদের 'পাহাড় অভিযান'। খাড়া পাহাড়ের শরীর বেয়ে ওপরে ওঠা যে কী কষ্ট! কিন্তু আমাদের কোনো কষ্ট নেই, অপার পুলকে চঞ্চল হয়ে উঠেছে আমাদের দেহমন। শিহরিত ভাবনায় ভোরের মেদুর হাওয়ার মতো বেয়ে উঠছি। সবুজের যুগন্ধি পুষ্পে কাতর হয়েছে হৃদয়। সবুজের অরণ্য ভেদ করে পাদদেশ মাড়িয়ে আমরা এবার চূড়ায়। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে বিজয়ের হাসিতে আমার মুখ কচি কিশালয়ের মতো কেঁপে ওঠে। অচেনা পাহাড়ি সুগন্ধি ফুল হাতে নিস্তব্ধ চূড়ায় আমি ব্যাকুল হৃদয়ে পৃথিবী দেখছি। আমি ক্লান্ত-শ্রান্ত। অন্যরা কোথায় জানি না। পাহাড়ের বৃক্ষের তলায় বসে পড়লাম। কিছু সময় পর ফিরে এলাম পাহাড়ের তলায়। সংবাদ পেলাম, বাকিরা ঝরনার দিকে আছে। পাহাড়ের পাদদেশ বেয়ে বানা অনেকদূরে। ঝরনার স্বচ্ছ পানি এদিকে আসতে আসতে একটা নালা তৈরি হয়েছে। আমি নালার স্বচ্ছ জলে আপন ছায়ার দিকে মুগ্ধ নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মাথা-মুখ ধুইলাম। অতঃপর হাঁটতে লাগলাম নালার পাশ বেয়ে। কী চমৎকার শোভা! পাহাড়ের পাদদেশে দুরন্ত বালকের ন্যায় এঁকেবেঁকে ছুটে চলা কৃত্রিম নালার পানি যেন তৃষিত আত্মার অমৃত সুধা। চারপাশে অযত্নে বেড়ে ওঠা সবুজালয় পত্র-পল্লবী যেন নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অপূর্ব বাহার। প্রবহমান খাল-নালা যেন নয়নাভিরাম কাশ্মীরি নির্ঝরিণীসমূহেরেই প্রতিচ্ছবি। আর সগর্বে দাঁড়িয়ে আকাশের মেঘছোঁয়া পাহাড়গুলো যেন সৌন্দর্যের জীবন্ত। কোথাও-বা পেঁজা তুলোর মতো ভাসমান মেঘসমূহের ছোটাছুটিতে ক্ষণে ক্ষণে রূপের পরিবর্তন ঘটায়। কত সুন্দর এ রূপ ও রং! কী বিস্ময় ও মাদকতা মিশে আছে তার সুন্দর বৈচিত্র্যে! শরীর ডুবিয়ে সবাই ঝরনার পানিতে গোসল দিলাম। শরীর নয় যেন প্রাণ ছুঁয়ে গেল। সন্ধ্যা কাটল নালার পারে। সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকু পাদদেশের একপাশে বসে অচেনা পাহাড়ি ফুলের সাথে উপভোগ করলাম।

আমরা সবাই এবার ফেরার পথে। সাথে কিছু অনুভব, অনুভূতি আর একরাশ প্রশান্তি।

সম্পাদক: মাসিক বুনোফুল

সবুজ গম্বুজের ছায়ায়

তাওহীদুর রহমান

পড়ন্ত বিকেল। সোনালি সূর্যটা ধীরে ধীরে হরিদ্রা বর্ণে রূপ নিচ্ছে। হ্রাস পেতে শুরু করেছে আলোর প্রখরতা। প্রকৃতির মাঝে ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো পাখিরা ফিরছে আপন নীড়ে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় জানালাম মক্কার পবিত্র ভূমিকে। ছুটে চললাম মদিনার উদ্দেশে। চারিদিকে ঊষর মরুভূমি। শুষ্ক-উত্তপ্ত সু-বিশাল এই মরুদ্যানে রয়েছে ছোটো-বড়ো অনেক বালুর টিলা। লম্বা ছায়া পড়েছে টিলাগুলোর। দূরে পাহাড়শ্রেণি। সূর্য কখনো পাহাড়ের আড়ালে চলে যায়, কখনো দুই শৃঙ্গের মধ্যখানে দেখা দেয়।

অস্তমুখী সূর্যকে মনে হলো বিষণ্ণ; যেন আমারই মনের প্রতিবিম্ব। জানি না সূর্যের আলো আমার মনকে বিষণ্ণ করেছে কি-না! না-কি আমার বিষণ্ণতা তার উপর ছায়া ফেলেছে!

দেখতে দেখতে বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। প্রতাপশালী সূর্য হারিয়ে ফেলল তার তেজোদীপ্ত। চারিদিকে নেমে এলো নিকষ কালো অন্ধকার। মরুর বুকে মসজিদ থেকে ভেসে এলো আজানের ধ্বনি। দেওয়া হলো যাত্রাবিরতি। আদায় করলাম মাগরিবের সালাত। আমরা আবারও যাত্রা শুরু করলাম মদিনার উদ্দেশে। পথের দূরত্ব যতই কমে আসছে, হৃদয়ের ব্যাকুলতা ততই বেড়ে চলছে।

এদিকে আকাশের তারারা মিটিমিটি জ্বলছে। আমার বুকের ভেতর স্বপ্নের জোনাকিরাও নিভছে। কত দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষিত স্বপ্ন আজ পূরণ হতে চলেছে। জানি না কেমন হবে আমার হৃদয়ের অনুভূতি—সবুজ গম্বুজ প্রথম দেখার মুহূর্তে। আমার হৃদয় পারবে তো সেই সবুজের পূণ্যস্পর্শ গ্রহণ করতে! আমার আত্মা পারবে তো সেই সবুজের নুরে অবগাহন করতে!

আলহামদুলিল্লাহ, অবশেষে পৌঁছে গেলাম সোনার মদিনায়। মুসাফির পৌঁছে গেল তার স্বপ্নের শহরে। গাড়ি থেকে নেমে যখন মদিনার সোনালি ধুলোর প্রথম স্পর্শ গ্রহণ করলাম, তখন হৃদয়ের অনুভব-অনুভূতি কেমন ছিল তা প্রকাশ করার সাধ্য আমার কলমের নেই। মনে হলো এটাই ফেরদাউস, এটাই জান্নাত। আসমান থেকে যেন নুরের শিশির ঝিরঝির করে ঝরছে। চারদিকে শুধু আলো আর আলো, সুবাস আর সুবাস।

ঘড়ির কাঁটা তখন দশটা ছুঁই ছুঁই। কাফেলার প্রধানের নির্দেশে রাতের খাবার ও এশার নামাজের পর যুক্ত হলাম এক নুরানি জামাতের সাথে। রওনা হলাম প্রিয় হাবীবের রওজার দিকে। দুরুদের রিমঝিম বৃষ্টি ঝরছিল সকলের জবান হতে, আমিও ছিলাম তাদের সাথে। অবশেষে উপনীত হলাম স্বপ্নের দ্বারপ্রান্তে; সবুজের ছায়াতলে। ওই যে আমার স্বপ্নের সবুজ গম্বুজ। ওই দেখো সবুজের জান্নাত, জান্নাতের সবুজ! কী তার মায়াবী রং, আর মমতাময়ী আকৃতি! যেন এক টুকরো পরশপাথর। অবনত দৃষ্টি, দুরুদুরু বুক ও বিগলিত হৃদয়। সকলে ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে পেশ করলেন দুরুদ ও সালামের নাজরানা। কণ্ঠে কণ্ঠে আমিও বললাম —الصلاة والسلام عليك يا رسول الله

সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

জন্মদিনের বার্তা

আজ আমার জন্মদিন। আঠারো বছর পূর্ণ হলো। সকালের মৃদু নির্মল বাতাসে চেয়ারে বসে ভাবছি নানান কথা। আবোল-তাবোল চিন্তা। আনমনে বসে থাকতে থাকতে বুঝতে পারলাম— বুকটা কেমন যেন জ্বালাপোড়া করছে।

সকল কাজকর্ম শেষে ফ্রেশ হয়ে, বেলা বারোটায় ভাত খেতে বসলাম। ভাত খাওয়ার পর ব্যথাটা আরও তীব্র হয়ে উঠল। পেপটিক আলসার হয়েছে নিশ্চয়। আম্মার শরীরটাও কয়েকদিন যাবৎ ভালো নেই। অনেকক্ষণ যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে বিমূঢ় হয়ে পড়ে রইলাম। ওষুধ খেয়েও তা উপশম হচ্ছিল না। অবশ্য আল্লাহর রহমতে বিকাল তিনটায় কমে এলো এই অসহ্য জ্বালা।

শ্রাবণের বিদায়ের ক্ষণে আকাশের চোখে আজ অশ্রুভরা। সদ্য স্বাধীন দেশে রক্তের ছাপ এখনও মুছে যায়নি। থামেনি শোকাতুর মানুষের আর্তনাদ।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিয়েছেন। চারদিকে চলছে প্রবল উত্তেজনা। আমরা আন্দোলন করলাম বৈষম্যের বিরুদ্ধে; অথচ আরেকটি রাজনৈতিক দলের চুনোপুঁটিরা ভাবছে তাদের হাতে ক্ষমতা চলে গেছে। এখন তারা চারদিকে দাপটে বেড়াচ্ছে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর খবরদারি করছে।

আজ মুরাদনগরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মত-বিনিময় সভা ছিল। শরীর খারাপ থাকায় যেতে পারলাম না।

আসরের পরে আকাশ ভেঙে ঢল নামল। পুরো আকাশটাই নেমে এলো যেন। দিক-দিগন্তব্যাপী চিরমুক্ত বারিধারা উচ্ছ্বসিত আবেগের মতো ঝরে পড়ল। তখন মসজিদে ছিলাম। বৃষ্টি থামলে বাজারের দিকে বের হলাম। চারটি 'ইনু' কিনে বাড়ি ফিরলাম। টিউশনিটাও আজ করতে পারলাম না।

জানি না, কেন যেন আজ মন বারবার উদাস হয়ে যাচ্ছে। সূর্য কখন ডুবে গেল তা কে জানে! আঁধারের সাথে ভারাক্রান্ত মন ছেয়ে গেল অনিশ্চয়তার চাদরে। আকাশের বুকে তারা নেই। মেঘাচ্ছন্ন গগনের ঘোর কালো ছায়া এসে পড়ে পৃথিবীতেও।

আর জন্মদিন! সেতো ভুলেই বসে আছি। জন্মদিন আর কি! দিন তো দিনই। অন্যদিনের মতো আজও সূর্য উঠেছে, পাখিরা গান গেয়েছে, অনন্ত সবুজ পৃথিবী বৃষ্টির জলে ভিজেছে। নিত্যদিনের পরিণতি দেখিয়ে সূর্য আবার ডুবেও গেল। বিশ্বসংসার তার অনিবার্য কাজটি করতে ভুলে নাই। কেবল তরুছায়ার মতো স্তব্ধ দিনটি কানে কানে বলে গেল, " কবি, সময় যে চলে যায় "।

শেখ আবদুর রহমান

মুরাদনগর, কুমিল্লা
আগস্ট,১০, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ, শনিবার।

শিশিরভেজা ঘাসে

গ্রামে আসার পর থেকে মনটা খাঁখাঁ করছে। চারপাশের শূন্যতা আমাকে বিষণ্ন করে রাখে। কোলাহলময় এই বাড়িঘর আজ গভীর নীরবতায় স্তব্ধ। হেমন্তের সকালে হাঁটতে বেরিয়েছি। সূর্যের লালিমায় ঘাসের ডগায়, পাতার বুকে লেগে থাকা শিশিরবিন্দু চিকচিক করছে। পল্লবিত তরুরাজি হিমেল হাওয়ার স্পর্শ পেয়ে নড়েচড়ে উঠছে। বাড়ির পেছনে আমাদের পারিবারিক কবরস্থান। বাড়িতে আসার পর এইখানে আমাকে কিছু সময়ের জন্য দাঁড়াতে হয়। মাটির ঘরে রেখে আসা প্রিয় মানুষগুলোর অশরীরী অস্ফুটস্বরের আওয়াজ পাওয়া যায়।

দেওয়াল ঘেঁষে দাদুর কবর, বাবার কবর। কিছুদিন আগেও যাদের সাথে কথা হতো, তাদের কবর। দূর অতীতের সেসব প্রিয়দের কবর, যাদের অমলিন স্মৃতির ছায়া হৃদয়পটে এখনও ভেসে ওঠে। কবরের পাশে যখন দাঁড়াই, শুনসান নীরবতার বরফ গলে কোলাহলের তপ্ত আওয়াজ আছড়ে পড়ে কবরস্থানের দেওয়ালজুড়ে। শুষ্ক কণ্ঠে সুরা ফাতিহা, সুরা ইখলাস, সুরা

ইয়াসিন, ইস্তেগফার ও দরুদ শরিফ পাঠে মগ্ন হই। তপ্ত আওয়াজ থেমে যায়। সুগভীর নীরবতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে কবরের দেওয়াল ও তরুলতা। এমনকি অদূরে বসে থাকা ধূসর রঙের পাখিটাও। প্রতিটি কবরে বয়ে চলে পুণ্যের ঝরনাধারা। প্রিয়মানুষদের মনের ক্যানভাসে রেখে যাওয়া হাসির শব্দ পুনর্বার আবিষ্কার করি। শীতল চোখে রবের দরবারে আর্জি জানাই—'রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানী সাগীরা...'।

সকালের শিশিরভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পা ভিজে যাচ্ছে। তনুমনে প্রকৃতির আর্দ্রতা মেখে মেঠোপথে হাঁটছি। মেঠোপথের দু-পাশে আমন ধানের সোনালি শিষ। হেমন্তের বাতাসে আমন ধানের গন্ধ। হেমন্তের এমন নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে জীবনানন্দের কবিতার কথা মনে পড়ে গেল—

শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের খেতে; মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার—চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ
তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান,
দেহের স্বাদের কথা কয়।

ছোটোবেলায় কবি সুফিয়া কামালের হেমন্ত নিয়ে লেখা কবিতাটি এখনও মনে দোলা দেয়—

সবুজ পাতার খামের ভেতর
হলুদ গাঁদা চিঠি লেখে
কোন পাথারের ওপার থেকে
আনল ডেকে হেমন্তকে?

আমনের সোনালি ধান পেরোলেই আমাদের নদী। ঘাসের ডগায় শিশিরের মতো এই নদীতে ভিজে আছে আমার শৈশব-কৈশোরের দিন। বর্ষায় সাঁতার কাটা, কলা গাছের ভেলায় চড়ে শাপলা শালুক তোলা ও নদীর পানিতে মাছ ধরা। গ্রামে এলে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনের দর্পণে সবসময় ভিড় করে। যান্ত্রিক যুগের যাপিত জীবনে অতীতের অমলিন স্মৃতির ছায়া অবলম্বন করেই বেঁচে থাকতে হচ্ছে।

মো. আশিকুর রহমান খান
জামিয়া কাশেফুল উলুম হাটখোলা মাদরাসা মধুপুর টাংগাইল।

একটি মোহমুগ্ধ দিন এবং বিষাদের খেরোখাতা

পৃথিবীর দীপাবলি নিভে গেছে। রাত্রি জুড়ে অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকার নৈঃশব্দ্যের রাজত্ব। আমি এক নিঃসঙ্গ রাত্রিচর; নির্বিকার-নক্ষত্রহীন আকাশে নিষ্কম্প পিদিমের মতো তাকিয়ে আছি। না কোথাও আলোর লেশমাত্র নেই। নৈঃশব্দ্য গাঢ় হচ্ছে। মনে হচ্ছে কোনো নিস্তব্ধ কবরে মুখ গুঁজে বসে আছি। এসব নির্ঘুম নিশীথের ক্যানভাসে আমি রোজ রোজ স্বার্থপরতার গল্প লিখি।

তখন আঁখিজলে সজল হয়ে ওঠে কিছু অনাহুত বিষণ্নতা। যেই বিষণ্নতা একান্তই আমার। যেই বিষণ্নতা আমাকে একটা অপমৃত্যুর দুয়ারে বসিয়ে রাখে। চরম ঘৃণা আর নিন্দাভরে মানুষ যার নাম দিয়েছে 'আত্মহত্যা'। কিছু অদৃশ্য মায়া আপন আপন মুখশ্রী এমন 'অপমৃত্যু' থেকে ফিরিয়ে রাখে। হয়তো এমন অদৃশ্য মায়া আপন মুখশ্রী আমাকে আরও কয়েকটা যুগ বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে।

খানিক বাদে উদয়াচলে দেখি আলোর দীপ্তি। একটি স্নিগ্ধ ভোরের নিষ্পাপ অবয়ব। তখনও একমুঠো রোদ্দুর পেয়ে পৃথিবী চোখ মেলে হাসেনি। কুঞ্জবনে প্রভাতের গুঞ্জরণ হতে থাকে। দূর্বাঘাসে লেপ্টে থাকে পবিত্র

কদমের ছাপ। হেমন্ত ঘুমায় একটি হলুদ ফুলের কোলে। তারপর একটি নীল প্রজাপতি উড়ে আসে। হলুদ ফুলের বুক পেতে বসে। হেমন্তের ঘুম ভেঙে যায়। দেখা মেলে পৃথিবীর খুশিয়াল মুখ। হেমন্তের স্নিগ্ধ সকাল। কালবিলম্বে দুপুর আসে। ঝুম বৃষ্টি শেষে জেগে ওঠা রংধনুর সাতরঙা দুপুর। স্নিগ্ধ সকাল সাতরঙা দুপুর আর অবসন্ন বিকেল শেষে একটা ধূসর সন্ধ্যার মাঝে বসে থাকি। দিনমণি তখন দিগন্তের শেষ বৃক্ষকে ফিরে আসার বাহানা শোনায়।

চারপাশে কেমন ছোপ ছোপ অন্ধকার জড়ো হয়। আমার মাগরিবের মুসল্লায় একটা নির্লিপ্ত জীবনের পাণ্ডুলিপি পড়ে থাকে। বুকের মাঝে জমে থাকা দীর্ঘশ্বাস। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু হয়ে ঝরে। প্রভুর কাছে দুঃখের ফিরিস্তি পাঠাই ভেজা চোখে মনের আর্জি পেশ করি। আমার রোনাজারির নীরব দর্শক হয় একটা অবসন্ন শালিক; ও তখনও নীড়ে ফেরেনি।

বাইজিদ আফনান

চিতলমারী, বাগেরহাট।
০২ কার্তিক ১৪৩১

ওহে, প্রিয়তম শীত

সেদিন ছিল বুধবার। ভোর পাঁচটায় ঘুম ভেঙেছিল। ভোরের আলো আবছাভাবে দেখতে পেয়েছিলাম। হালকা হালকা ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছিল। ভেবেছিলাম, শরীরে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে, তাই এত ঠান্ডা লাগছে। কিন্তু ভাবনাটা ছিল ভুল। কারণ, আপনার স্পর্শের ছোঁয়ায় আমার এই ঠান্ডা অনুভব হয়েছিল।

প্রিয়তম, জানেন, আপনার আগমনি দেখে খুশিতে আত্মহারা হয়েছিলাম। জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখি চারপাশ ঘন কুয়াশায় ঢাকা। দূর থেকে গাছপালাগুলো আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। প্রকৃতির রূপ যেন ধোঁয়াটে চাদরে মোড়া। এত ঠান্ডা অনুভব হচ্ছিল যে, জানালার ধার থেকে নিজেকে যেন সরাতে পারছিলাম না। আপনার শান্ত হিমেল পরশে যেন বন্দি হয়ে গিয়েছিলাম।

সূর্যের কিরণের আবির্ভাব লক্ষ করেছিলাম। মুক্তার মতো ঝলমল করছিল। মায়ের ডাকের শব্দ শুনতে

পেলাম—মজাদার গরম গরম শীতের পিঠা খাওয়ার জন্য। তাড়াহুড়ো করে গিয়ে শীতের পিঠা উপভোগ করলাম। খেজুরের রসের ঘ্রাণে প্রায় মাতোয়ারা। ঘণ্টাখানেক পরেই, বাবা বাজার থেকে ভরপুর শীতকালীন সবজি নিয়ে হাজির হলেন। শীতের তাজা সবজির স্বাদ যেন সমস্ত বিখ্যাত খাবারকে হার মানায়।

দুপুরে পেটপুরে খেয়েদেয়ে রোদে বসে গল্প করতে লাগলাম। এক গল্পেই নিমিষে দুপুর গড়িয়ে বিকেল নেমে এলো। বিকেলের দিকে নদীর পাড়ে হাঁটতে বের হলাম। আহা! ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শে হৃদয়ের গহিনে আপনার প্রতি ভালোবাসা আরও বেড়ে গিয়েছিল। দেখেছিলাম, বাচ্চারা খেলাধুলায় ব্যস্ত। সেই মুহূর্তটা দেখে ছোট্টবেলার স্মৃতিগুলো মনে পড়ে গেল।

গাছতলায় বসে এক অপলক দৃষ্টিতে আপনার দিকে তাকিয়ে রইলাম। পাখির কলতানে এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। গোধূলির লগনে আকাশ সোনালি আভা ধারণ করেছিল।

সন্ধ্যায় এক কাপ চায়ের চুমুকে আপনার রূপের যে সুখটুকু খুঁজে পেয়েছিলাম, তার তুলনা কোথাও নেই। শীতবস্ত্র মুড়িয়ে গল্পের বইয়ের সাথে যেন এক গভীর প্রেমের আলাপ চলছিল। পুস্তকের প্রতিটি লাইন, শব্দ আর পৃষ্ঠায় আবেগ জমা হয়ে এক বিশেষ আমেজ তৈরি করেছিল। অলকখানি আপনার শীতল হাওয়ার ছোঁয়ায় এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল।

রাতের আকাশে চাঁদ কুয়াশার আবরণে ঢাকা পড়েছিল। চাঁদের আলোয় প্রকৃতি যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছিল। তবে চাঁদটি এক অসাধারণ মায়া সৃষ্টি করেছিল। কুয়াশায় ঢাকা চাঁদ আপনার রূপকে আরও বেশি স্নিগ্ধ করেছে এবং রাতটিকে বিশেষ করে তুলেছিল।

আজকের দিনটি ছিল এক চিরস্মরণীয় দিন। আপনার হিমেল পরশ আর রূপের ছোঁয়া আমার মনে বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাকে আরও দৃঢ় করেছে। আজকের দিনকে এত বেশি রাঙিয়ে তোলার জন্য, আপনাকে জানাই কৃতজ্ঞতা।

সৈয়দা ফারিহা আকতার

শিক্ষার্থী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম

শীতের সকাল

শেষ রাত্রি। কনকনে শীত। ছোট্ট শিশুর মতো জড়সড়ো হয়ে শুয়ে আছি লেপের উষ্ণ বুকের মধ্যে। টিনের চালে কুয়াশার টুপটাপ ছন্দে ইচ্ছে হয় আবার ডুবি সুখনিদ্রায়। আম্মু এসে দ্বিতীয়বার ডেকে যান— 'পানি গরম করেছি, জলদি অজু করে মসজিদে যাও।' লেপের ওম ছেড়ে উঠতে মনের সাথে একরকম যুদ্ধই করতে হয়। চাদর মুড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে নিই।

বাড়ি থেকে বের হতেই শীতের কুয়াশারা বন্ধুত্ব গড়ার প্রস্তাবে আমাকে ঘিরে ধরে। টর্চ লাইটের আলোয় গাছগাছালির জবুথবু দাঁড়িয়ে থাকা

দেখে আমার কেমন মায়া হয়। মসজিদে যেতে যেতে ঠান্ডায় দাঁতে দাঁত বাড়ি খেতে শুরু করে। সুন্নত নামাজ পড়ি। ইমাম সাহেব হুজুর ফরজের জন্য আমাকে এগিয়ে দেন। হুজুরের নির্দেশ পালনার্থে ইমামতি করি।

নামাজের পর দেখা হয় বাল্যবন্ধু তানভীরের সঙ্গে। কতদিন পর দেখা! হালপুরসি করতে করতে হাঁটতে থাকি স্কুলমাঠের দিকে। পথে একটা শিউলিগাছ চোখে পড়ে। গাছতলায় আকাশের তারার মতো ছড়িয়ে আছে অগণিত ফুল। মিষ্টি সুগন্ধ। কী স্নিগ্ধ অনুভূতি! কতগুলো ফুল কুড়িয়ে নিই।

মাঠে গিয়ে দেখি শালিক-সমাবেশ। অর্ধেক মাঠভরতি শুধু শালিক পাখি। ইচ্ছেমতো গান গাচ্ছে। ওড়াউড়ি করছে। শালিকদের দেখাদেখি স্কুলের সিঁড়িতে বসে কথার পিঠে কথা তুলে আমি আর তানভীরও জমিয়ে তুলি শৈশবের স্মৃতিচারণ। সময়গুলো কেমন প্রজাপতির ডানার মতো রঙিন হয়ে ওঠে। সকালের মিষ্টি রোদ এসে পড়ে সবুজ ঘাসের ডগায়। শিশির বিন্দুগুলো মনি-মুক্তার মতো দেখায়। গল্পের আসর ভেঙে আমরা উঠি।

স্কুলের পেছন থেকে গাছি কাকা রসের হাঁড়ি নিয়ে হেঁটে যায়। আমরা কছে যেতেই তিনি প্লাস্টিকের মগে ঠান্ডা খেজুরের রস পরিবেশন করে। অমৃতের মতো পান করি। খেজুরের রসের মতো মিষ্টি হয়ে ওঠে আমাদের মন। গাছিকে রসের মূল্য চুকিয়ে আমরা বাড়ির পথ ধরি।

মজহুল
শিক্ষার্থী, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

স্মৃতির অ্যালবামে

জানুয়ারির শেষ। হালকা শীত আর হালকা গরমের সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত আবহাওয়া। প্রকৃতি ব্যস্ত নতুন ঋতুর অমোঘ চক্রের আয়োজনে।

মাথার উপর বিষণ্ণতায় ভরে ওঠা নীল আকাশ। চারপাশে ব্যস্ত শহরের ধূসর কোলাহল। শহরের ব্যস্ততাকে পেছনে ফেলে হেঁটে চলা এক পথিক। উদ্দেশ্য অজানা। সেই বিরহবিধুর দিনে প্রিয় আঙিনা আর প্রিয় মানুষগুলোকে ছেড়ে আসার দুঃখে আমার শহরজুড়ে কালো মেঘেরা দুঃখবিলাস করেছিল। সেদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের অজান্তেই দু-ফোঁটা জল বৃষ্টি হয়ে পড়েছিল আমার শহরজুড়ে।

অতঃপর গত হওয়া দিনগুলোর ধুলোবালি জমা স্মৃতিগুলোকে সঙ্গী করে শুরু আগত দিনের পথচলা। নিয়মমাফিক জীবন—প্রত্যেকটা ঘুমে ধরা ভোর, মনোযোগ শূন্য ক্লাস আর একাকিত্বে বুঁদ হয়ে থাকা নিঝুম রাত—দিব্যি কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো।

নির্ঘুম রাত পেরিয়ে ঝলমলে ভোর। গ্রামের চিরচেনা সরু পথ। কিছু অচেনা মানুষের মুখোমুখি হওয়া, থেমে যাওয়া সময়। অতঃপর, গভীর বিশ্বাস আর হাতে হাত রেখে পাড়ি দেওয়া হাজারো পথ!

বড্ড অবাক লাগে...তোমরা কী নিদারুণভাবে মিশে গেলে আমার অস্তিত্বজুড়ে! সময়ের সাথে সাথে আমাদের সম্পর্ক হতে লাগল গাঢ়। যেমন নিঝুম রাতে দুঃখেরা গাঢ় হয়।

কিন্তু...হঠাৎ সময় ফুরিয়ে ডাক এলো নীড়ে ফেরার। গত হতে চলল অযাচিত এক বিষণ্ন গল্পের। চলে যেতে হবে বহুদূর—যেখানে উপভোগ করা যায় ভোরের স্নিগ্ধতা আর মনের তৃপ্তি। বিষাদচূড়ায় মেঘের সাথে আড়ি কেটে ফুরিয়ে যাব আমিও। হয়তো চিরতরে...

এই অন্তিমসময়ে বড্ড জানতে ইচ্ছে করে—যেদিন থেকে আমি আর নিয়ম করে অনলাইনে আসব না কিংবা সেই চিরচেনা রাস্তার মোড়ো অথবা চায়ের আড্ডায় আর দেখা হবে না, সেদিন কি তোমরা আমায় ভুলে যাবে? অবসর কোনো সময়ে কিংবা নিঝুম রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে কি মনে পড়বে আমায়? ইা-কি সময়ের সাথে সাথে তোমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাব আমি হাজারো মানুষের ভিড়ে!

কিছু বছর কিংবা কিছু কাল পর, হয়তো ভুলে যাবে আমায়! কিন্তু তোমরা থেকে যাবে আমার কবিতার প্রতিটি লাইনে। কল্পনা আর স্মৃতির আবডালে তোমাদেরকে বন্দি করে রাখব মনের অ্যালবামে। আর সেই অ্যালবামকে ভীষণ ভালোবেসে আগলে রাখব আমার বুকের বাঁ পাঁজরে।

মো. মাকসুদল হক রাফাত
ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

হাহাকার

ভোরের হিমেল হাওয়ায় রেললাইন ধরে কী মনে হাঁটছি! ভেতরটায় হাহাকার। গোল চাঁদটা চোখের সামনে হারিয়ে গেল। ধীরে ধীরে চারিদিক ফুটে উঠল। প্রভাত সূর্য উদিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে হাঁটতে হাঁটতে নদীর পাড়ে গিয়ে একটু প্রশান্তি খুঁজলাম। কিন্তু বাতাস নেই। বসে রইলাম তবুও। কখন একটুখানি স্পর্শ দিয়ে মন ছুঁয়ে, ধুঁয়ে দেবে ভেতরটা। অনেকক্ষণ নদীর বুকে ঢিল ছুড়লাম। কেন যেন সে সাড়া দিলো না। গোমটবদ্ধ হয়ে সবকিছু মুখ গোমড়া করে আছে। অথচ এখানেই নদীরা মিলিত হয়েছে নীরব নয়, উন্মাতাল বন্ধনে। চলে গেলাম...

সারাদিন উত্তাপ বর্ষণে দগ্ধ হয়ে আবার সূর্য ডোবার আগে নদীর পাড়ে এলাম। নিঃসঙ্গতা দূরে চললে, একাকিত্ব উপভোগে সাড়া দিল না। মৃদু বাতাস ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যটা একটু আগে বিদায় নিল। আকাশটা কালো মেঘে ঢেকে তাকে গ্রাসে নিল। সন্ধ্যার আকাশে তাকাতেই এত আলোতে চোখ উজ্জ্বল হয়েও কেন যেন আবদ্ধ লাগছে।

এই পূর্ণিমাও কেন হাহাকার করে?!

রাহিল

মাদানীনগর। নারায়ণগঞ্জ।

নৌকাবিলাস

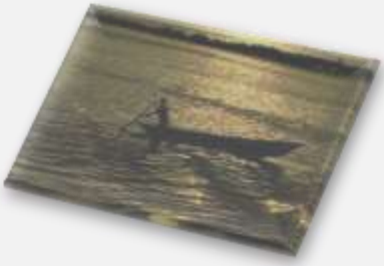

বাইরে চৈত্র মাসের ঝাঁঝালো রোদ নয়, শীতের দুর্বল রুদ্দুরও নয়। বরং মিঠে রোদে জড়িয়ে আছে এক আদুরে ছোঁয়া। মেঘের আড়ালে-আবডালে বসে মিটমিট করে হাসছিল রক্তলাল সূর্যটি। গন্তব্য নদীর ওপার। ছুটছি হাওয়ার তালে হেলেদুলে। মাল্লার আসন দখল করে আছেন বিনোদন বন্ধু মাকসুদ। দক্ষিণা বাতাসের তালে তালে নদীর বুক চিরে ছুটে চলছে তরি, যেন গন্তব্যহীন পাগলা ঘোড়া। অবশেষে তরির মাথা গিয়ে ঠেকল ওপারের মাটিতে। খোশগল্পের ফাঁকে হুজুরভক্ত এক ব্যক্তির ফসলি জমির চিরসবুজ রঙের ছোঁয়া নিয়ে পৌঁছলাম গন্তব্যে।

সেখানের লোকজন বেশ অতিথিপরায়ণ। চা ভরতি ফ্লাস্ক আর ফল ভরতি রেকাবি নিয়ে হাজির হলো কোমলমতি শিশু ও মধ্যবয়সি তরুণরা। আহার-বিহার শেষে ধান খেতের বুক চিরে বয়ে যাওয়া সরু পথ ধরে হেঁটে হেঁটে নদীর তীরে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেলের সূর্য আকাশে। উত্তর-পশ্চিম দিক হয়ে হিমশীতল বাতাস বইছে নদীর স্বচ্ছ সলিল ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

মাঝি তখন নৌকায় নেই। এই সুযোগে বইঠা হাতে নিয়ে জল কেটে সামনে এগোনোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু নৌকা শুধু লাটিমের মতো ঘুরপাক খেতে লাগল। অনেকক্ষণ পর নিজেকে আবিষ্কার করলাম সেখানেই, ঠিক যেখান থেকে নৌকায় উঠেছিলাম।

নতুন মাঝি হওয়ায় নদীর ওই তীরে যাওয়ার স্বপ্ন সস্তা কাচের মতো ভেঙে পড়ল। কিছুক্ষণ পর মাঝি সাহেব আমাদের এসব কাণ্ড শুনে বেশ হাসলেন এবং নিজেই আমাদের নদীর ওপারে পৌঁছে দিলেন। নৌকা বিলাস, নদীর ছলছল জল, হিমশীতল বাতাস আর সূর্যের উঁকিঝুঁকি—সব মিলিয়ে সময়টা দারুণ কাটল।

ইয়াছিন আবরারী
লেখক

সেপ্টেম্বর ২০২৪ সংখ্যায় যারা সেরা লেখক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

লেখক পুরস্কার

গণ-অভ্যুত্থান সংখ্যা

মাসিক নবীনকণ্ঠ সেপ্টেম্বর-২০২৪ সংখ্যায়, যে-চারজন লেখক **‘সেরা লেখক’** নির্বাচিত হয়েছেন:

১. মাসুম আলভী — প্রবন্ধ
২. জিয়া হক — ছড়া
৩. ওমর ইবনে আখতার — স্মৃতিগদ্য
৪. আমাতুল্লাহ শারমিন — গল্প

নির্বাচিত লেখকগণ নবীনকণ্ঠ’র ফেসবুক পেজের ইনবক্সে যোগাযোগ করুন

সহযোগিতায়

দৈনিক দেশচিত্র — যেখানে বাঙালি সেখানেই আমরা

TIJARAH ASLI
তিজারাহ আসলী

নবীনকণ্ঠ
তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে...

সৌজন্যে:

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম

(শুদ্ধ লেখনীর ধারায় সুদূর অগ্রযাত্রা)

ব্যবস্থাপনায়

ও. এম. পাবলিকেশন্স

(তারুণ্যের সৃজনশীলতা বিকাশে দৃঢ় প্রত্যয়)

ইমেইল: nobinkanthobnlf@gmail.com
যোগাযোগ: 01789204674